রায়চক থেকে সিঙ্গুর -- শিল্পায়নের নোটখাতা

এই লেখায় জন পার্কিনসের একটি বইয়ের কিছু অংশের অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুবাদ ও তৎসংলগ্ন টীকাগুলি ত্রিদিব সেনগুপ্তর করা।

১।

আজ থেকে বছর আটেক আগের কথা। তখন ১৯৯৯ সাল। রায়চকের একটি তারকাখচিত হোটেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুশোর বেশি 'শিল্পপতি' এবং বেশ কিছু রাজনীতিবিদ, যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। অনুষ্ঠানটির একটি গালভরা নাম দেওয়া হয়েছিল। 'গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ' বা ডেস্টিনেশন ওয়েস্টবেঙ্গল। কেন এই নাম? কারণ এর কিছুদিন আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুভব করেছিলেন, যে, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অভাব। এবং এই নামকরণ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, যে, শিল্পপতিদের পরবর্তী গন্তব্য যে পশ্চিমবঙ্গই হওয়া উচিত, এই ব্যাপারে সরকারী মহলে এবং তদানিন্তন সিপিআইএম পার্টির উপরতলায় একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো হয়েছিল। এই ঐকমত্যের জায়গা থেকেই, বিখ্যাত বহুজাতিক ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্সি ম্যাকিনসের কাছ থেকে, ঠিক কোন পথে এগোলে শিল্প হতে পারে, এই নিয়ে মতামত, অর্থাৎ কনসাল্টেন্সি চাওয়া হয়। তারা কিছুদিন রাজ্যের অবস্থা খতিয়ে দেখার পরে রাজ্যসরকারকে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দেয়। সেই রিপোর্টটি প্রকাশিত না হলেও, এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিতে, যার নাম ছিল ডেস্টিনেশান ওয়েস্টবেঙ্গল, ম্যাকিনসের একজন কর্তাব্যক্তি, অশ্বিন আদরকার, সমবেত শ্রোতৃমন্ডলীর সামনে একটি দীর্ঘ প্রেজেন্টেশন দেন।

প্রেজেন্টেশান প্রসঙ্গে আসার আগে অশ্বিন আদরকারের একটু পরিচিতি দিয়ে নেওয়া ভালো। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির স্নাতক এই উজ্বল ছাত্রটি ঐ ইউনিভার্সিটি থেকেই স্নাতকোত্তর এবং ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি পান। ম্যাকিনসেতে 'পার্টনার' হিসাবে তিনি যোগদান করেন ১৯৯২ সালে, এবং ম্যাকিনসের ভারতীয় অপারেশন খোলার পিছনে এঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বেশ কিছু বছর ভারতের বিভিন্ন হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টকে কনসালটেন্সি দেবার পরে তিনি ২০০৩ সালে ইন্ডিমার্ক কনসিউমার ব্যাঙ্কে সিইও পদে যোগদান করেন।

এই হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শিল্পোন্নয়ন বিষয়ে কি করণীয়, তা বাতলে দেন, এবং ডেস্টিনেশন ওয়েস্টবেঙ্গল নামক ঐ বিশেষ সভাটিতে, যা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে একটি ল্যান্ডমার্ক হিসাবে চিহ্নিত, একটি দীর্ঘ প্রেজেন্টেশন দেন। প্রেজেন্টেশনটি ছিল ৫৫ পাতার। ঐ প্রেজেন্টেশনে তিনি জানান, যে, যদিও পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি সামর্থ্যের জায়গা আছে, কিন্তু, মূল সমস্যা হল, এই সামর্থ্যের জায়গাগুলি 'ওভারশ্যাডোড বাই ইটস পাস্ট প্রবলেমস'। এবং, বিনিয়োগকারীদের পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যে বিরূপ ধারণা আছে, সেটা শুধু ভাবমূর্তিজনিত কারণে নয়, বরং বর্তমান বাস্তবতার কারণেই।

তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে আদরকার আরও জানান, যে সরকারি প্রোজেক্টে টাইম-টেবলের সমস্যা আছে। লাল ফিতে এবং শ্রমিকদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের সমস্যা আছে। উনিশশো পঁচানব্বই সালে পশ্চিমবঙ্গে গুজরাটের চেয়ে সাড়ে চারগুণ বেশি শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। এবং যদিও সরকার এক-জানলা নীতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু সবাই জানে, যে, 'ঐ একটি জানলার পিছনে অনেক দরজা আছে'।

এবং আদরকারের প্রেসক্রিপশান কি ছিল? পশ্চিমবঙ্গকে দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে মাপকাঠি করে এগোলে চলবেনা। বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশ, যেমন সিঙ্গাপুর, বা তাইওয়ানকে করতে হবে মাপকাঠি। শিল্প-সরকার-শ্রমিক সবাইকে জোট বেঁধে অন্ততঃ হলদিয়া পেট্রোকেমিকালের ধরণের একটি প্রোজেক্টকে সময়সীমার মধ্যে শেষ করতে হবে। এবং প্রেজেন্টেশনটি শেষ হয় পশ্চিমবঙ্গের বাম নেতাদের বিশেষ একটি আহ্বান জানিয়ে। যে, 'বৈপ্লবিক' পরিবর্তনের দিকে এগোতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে।

২।

ম্যাকিনসে প্রেসক্রিপশনটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষেই, অন্ততঃ একটি বিষয়ে, নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকেই একটি চমৎকার ঐকমত্য দেখা যাচ্ছে। যে, শিল্পায়নের মডেল হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ঝা-চকচকে অফিস হবে। বিশেষ পরিকাঠামো বানাতে হবে। এই বিশেষ পরিকাঠামো যেন ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে তুলনীয় হয়। এবং অফিস/কারখানা খুলবে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি। যেহেতু গোটা ভারতবর্ষকেই আমেরিকা বানানো সম্ভব নয়, অতএব, ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চে এসেছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ধারণা। যা, ভারতবর্ষের মধ্যে একেকটি মিনি আমেরিকা।

এই পুরোটাই যদি ১৯৯৯ এর ম্যাকিনসে রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পড়ি, দেখব, লক্ষ্য হিসাবে আলাদা কিছু ভাবা হচ্ছেনা। শিল্পায়নের মডেল হিসাবে ধরা হচ্ছে সেই 'উন্নত' দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে। এবং আজ, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন বারবার বলেন, যে, কৃষি থেকে শিল্প, এইটাই পথ, এইটাই সভ্যতা, তখন, তিনি ঠিক এই মডেলেই ভাবেন। যে, কৃষির জায়গায় আসবে ভারি শিল্প। হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি। রাস্তায় আর গরুর গাড়ি চলবেনা, কৃষিজীবীরা কৃষি ছেড়ে ক্রমশ উন্নত শিল্পের কর্মচারী হয়ে উঠবে। জীবন-যাপনের উন্নতি হবে। এবং হংকং বা সিঙ্গাপুরের জীবনযাপনের যে দিকগুলো আজ শুধু স্বপ্ন হয়ে বেঁচে আছে বাঙালির মনে, সেগুলো বাস্তবায়িত হবে।

এটি অ্যাজেন্ডা নম্বর এক। এবং, খুব আকর্ষণীয়, যে, এই অ্যাজেন্ডাটি তথাকথিত ভারতীয় সিভিল সোসাইটিতে একটি ঐক্যমত্যের জায়গায় পৌঁছেছে। সরকার, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, বড়ো শিল্পপতি, মিডিয়া, সবাইই, এই অ্যাজেন্ডার বাহকে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। যে, আর পিছিয়ে থাকা নয়, এবার শিল্পে 'উন্নত' হতে হবে। তার জন্য তৈরি করতে হবে যথাযোগ্য পরিকাঠামো। সুবিধা দিতে হবে শিল্পপতিদের। শিল্পপতিদের জন্য তৈরি করতে হবে বিশেষ পরিষেবার এলাকা, যা গুণমানে পশ্চিমের পরিষেবাকে পাল্লা দেবে। তৈরি করতে হবে সত্যিকারের এক-জানালা পদ্ধতি। সরাতে হবে লাল ফিতের

ফাঁস। মজা হচ্ছে, এই বিশেষ পরিষেবা শুধু শিল্পের জন্যই, অর্থাৎ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে যেমন তৈরি হচ্ছে ছোটো ছোটো আমেরিকা, তেমনই, পরিষেবার ক্ষেত্রেও থাকবে ছোটো ছোটো আমেরিকা, যা শুধু শিল্পপতিদের জন্য বরাদ্দ।

অ্যাজেন্ডা নাম্বার দুই ও চলে আসছে এর গায়ে গায়ে। ফ্রি মার্কেট ও ফ্রি কম্পিটিশন। অর্থাৎ রাজ্যগুলিকে এবার বিনিয়োগ ধরার লড়াইয়ে নামতে হবে। অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে নামতে হবে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায়। যে রাজ্য পরিকাঠামোয় বেশি উন্নতি দেখাতে পারবে, শিল্পপতিদের বেশি সুবিধে দিতে পারবে, বিনিয়োগ টানার লড়াইয়ে সে ততো জিতবে। শিল্পপতিদের এই বিশেষ সুবিধা দেবার খেলাকে প্রভাত পট্টনায়ক বলবেন ‘সামাজিক ঘুষ’, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যাবে আসবেনা। একেকটি শিল্প নিজের রাজ্যে টেনে আনতে পারলে সেই রাজ্যের মিডিয়া-বুদ্ধিজীবীকুল তাকে আখ্যা দেবে রাজ্যের এক বিরাট জয় বলে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা আমলা বা সাংসদ পাবেন নায়কের মর্যাদা। এবং পাশের যে রাজ্যটি হেরে গেল, তাকে দুয়ো দেওয়া হবে। সিঙ্গুরে জমি না দেওয়া গেলে রাজ্যের সর্বনাশ হতো বলে ব্যাখ্যা করবেন মুখ্যমন্ত্রী, কারণ তাহলে এই কারখানা চলে যেতে পারত অন্য রাজ্যে। জ্যোতি বসু জানাবেন, যে, এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে যে শিল্পায়ন করা যায়নি, এবার, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেটাই করে দেখাতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তো, এই আলোচনায়, আমরা এই দুই ও এক নম্বর অ্যাজেন্ডাকে আলোচনায় এনে ফেলব। প্রশ্নটশ্নও করব। সেটা এক-এক করে করে ফেলা যাক পরের অনুচ্ছেদগুলোয়।

৩।

এক এক করে আলোচনায় ঢোকা যাক। প্রথমে দুই নম্বর অ্যাজেন্ডা। ফ্রি মার্কেট ও ফ্রি কম্পিটিশান।

দুহাজার পাঁচের নভেম্বর মাসে পিপল্স ডেমোক্রেসির একটি লেখায় বিনয় কোঙার লেখেন : ‘পুরোনো এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলো ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কৃষির উপর চাপ বাড়ছে। নতুন শিল্পের দিকে কি আমাদের ঝোঁকা উচিত নয় ? শিল্প ছাড়া একটি দেশ বা একটি রাজ্য এগোতে পারেনা। সারা পৃথিবী জুড়েই উন্নত এবং সমৃদ্ধ দেশের মাপকাঠি হল, কৃষিতে কতো কম লোক নিযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র দুই থেকে তিন শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী।’

ঐ একই লেখায় তিনি সিপিআইএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রস্তাবকে উদ্ধৃত করে জানান, যে,“পরিস্থিতি আর ১৯৮৫ সালের মতো নয়, যখন সংগ্রামটা ছিল কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে, যার লাইসেন্স এবং রেগুলেশনের ক্ষমতা ব্যবহৃত হত পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে, বরং এখন ডিরেগুলেশন এবং ডিলাইসেন্সিংএর পর, পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার ধাপগুলির সূচনা করা এখন রাজ্যের উপর। কেবলমাত্র বিভিন্ন সেক্টরে আরও বেশি বেশি করে ব্যক্তিপুঁজিকে অনুমোদন দেবার মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব। কেন্দ্রের উদারীকরণের নীতি যে নতুন পরিস্থিতিতে সামনে এনেছে তার উপরে দাঁড়িয়েই পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে তার নীতিগুলিকে বদলাতে হয়েছে।”

তো, দেখা যাচ্ছে শিল্পায়নের মাপকাঠি হিসাবে সরকার বেছে নিয়েছে উন্নত দেশগুলিকে। এবং আরও জানা যাচ্ছে, যে, ইতিপূর্বে লড়াইটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে, যে কারণে রাজ্যে শিল্প হতে পারেনি। কিন্তু এখন উদারীকরণের সুযোগ নিতে হবে। এবং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টকে আকর্ষণ করতে হবে।

এটা কোথাও লেখা নেই, যে বিনিয়োগকে কিভাবে ডেকে আনতে হবে। সেটা থিয়োরাইজ করা বোধহয় সম্ভবও না। সেটা আমরা কার্যক্ষেত্রে দেখতে পেলাম রতন টাটার ছোটো মোটরগাড়ির কারখানা বানানোর প্রকল্পে। আমরা দেখতে পেলাম, যে বিনোয়োগ টেনে আনাটা আসলে একটা লড়াই। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ের কথা বলা হতো, এ লড়াই তার চেয়েও বড়ো লড়াই। এবং এই লড়াইয়ের লক্ষ্য আর কেন্দ্র নেই, হয়েছে অন্যান্য রাজ্যগুলি। লক্ষ্য বলা ভুল, যেহেতু মুক্ত প্রতিযোগিতা, তাই বলা উচিত, প্রতিদ্বন্দ্বী। বা শত্রু। এই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে শিল্প নামক রাজকন্যাকে জয় করে আনতে হবে, এই হল অ্যাজেন্ডা। এবং এই কাজের হাতিয়ার রাজ্যের 'শিল্পবন্ধু' ভাবমূর্তি তৈরি করা, এবং শিল্পপতিদের পর্যাপ্ত পরিমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। টাটা যে শিল্পস্থাপন করতে আসছেন, বা আসবেন, সেটা রাজ্য সরকারের মুখ দেখে নয়। যথেষ্ট পরিমান সুবিধে তাঁরা আদায় করেছেন সন্দেহ নেই। এবং কি-কি সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সেটা রাজ্য সরকার জানাতে অস্বীকার করেছে। কারণ, শিল্পমন্ত্রী নিরূপম সেন জানিয়েছেন, ওটা ট্রেড সিক্রেট। বললে টাটার অসুবিধা হতে পারে। আর টাটার অসুবিধা করা যাবেনা, কারণ, তাহলেই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যটি ছিনিয়ে নিয়ে যাবে শিল্প নামক রাজকন্যাকে।

ফলে পাশের রাজ্যটি আমার শত্রু হয়ে যাচ্ছে এই প্রক্রিয়ায়। তার সঙ্গে আমি যা করছি, তার নাম কামড়াকামড়ি। শিল্পের নাম করে, ফ্রি মার্কেটের নাম করে, রাজ্যে রাজ্যে এই যে কামড়াকামড়ি, এটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। এবং এই প্রতিযোগিতাকে মিডিয়া, সিভিল সোসাইটির একটা বড়ো অংশ স্বাস্থ্যকর বলে চিনছে, চেনাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর সন্দেহ নেই, তবে কার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো সেটাই প্রশ্ন। তো, এই প্রশ্নটাকেই একটু নেড়েচেড়ে দেখা যাক।

শিল্পপতিরা যেখানে বেশি সুবিধা পাবেন সেখানেই বিনিয়োগ করবেন। আর সব রাজ্যই ভিখারির মতো শিল্প চাইছে। ফলে সবাই একটু বেশি সুযোগ দিয়ে শিল্পকে টেনে আনতে চাইবে। ফলে সুযোগ-সুবিধার পরিমান ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটা বিপুল জায়গায় পৌঁছবে, যার চেয়ে কম সুযোগ দিলেই বিনিয়োগ আর সেই রাজ্যে যাবেনা। তাই শিল্পপতিদের সুযোগ, বা ভরতুকি বা সামাজিক ঘুষ দিয়েই চলতে হবে দরিদ্র রাজ্যগুলিকে, যদি তারা শিল্প আনতে চায়। এবং বিনিময়ে রাজ্যগুলি প্রবল ক্ষতির সম্মুখীন হবে, কারণ যে টাকাটা শিল্পপতিদের দেওয়া হচ্ছে ভরতুকি হিসাবে, সেটা আর ফিরে আসছেনা কোষাগারে।

তো এই খানে দাঁড়িয়ে রাজ্যগুলো দরকষাকষি করতে পারে কি ? সমস্যাটার প্যাটার্ন একেবারে ক্লাসিক গেম থিয়োরির কিছু প্রবলেমের মতো। এটাকে প্রথমে সেই ফরম্যাটে ফেলে দেখা যাক।

এক। রাজ্যগুলি একা একা দরকষাকষি করতে পারেনা। একা থাকলে তারা হারবেই।

দুই। জোট বাঁধলে দরাদরি অবশ্যই করতে পারে। সেক্ষেত্রে সব রাজ্যই অল্পবিস্তর জিতবে।

তিন। সেই জোট থেকে যদি একজন বেরিয়ে যায়, তাহলে যে বেরিয়ে গেল, সে বিপুল ভাবে জিতবে, এবং বাকিরা গোহারাণ হারবে।

এবার প্রশ্ন হল, এই খেলায় রাজ্যগুলো জিততে পারে কি ?

খুব খোলা চোখে দেখা যাচ্ছে, গেমটি লুজ-লুজ গেম। অর্থাৎ রাজ্যগুলোকে হারতে হবেই। কোনো জোটই টিকবেনা, কারণ, জোট থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে সামান্য সুযোগ দিলেই একাই ভোগ করা যাবে সকল বিনোয়োগের মধুভান্ড। ফলে জোট হবেনা। হারতে হবে জেনেও সবাই একা একাই থাকবে। এই দেশে হায় সকল রাজ্যই অভিমন্যু।

তবে শুধু এটুকুই নয়, এখানে একটা ব্যাপক মজা আছে, যেটা আমরা এখনও ছুঁইনি। লক্ষ্য করে দেখুন, বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোকে আচরণ করতে হচ্ছে এমনভাবে যেন তারা একেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টেট। মানে রাষ্ট্র। নিজের ভালো টা তোমরা নিজেরা ভালো বোঝো হে ছোকরা নইলে পরে পস্তাতে হবে, বলে তাদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বিনিয়োগের যুদ্ধে। এতে সুবিধে কার ? বড়ো পুঁজির। কারণ এভাবেই আদায় করা যাচ্ছে আরও আরও সুযোগ, আরও সুবিধা, যা, সাধারণ ভাবে অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই 'নিজের মাল নিজে সামলাও' শুধু পুঁজি ধরার জন্য। বাজার কিন্তু অখন্ড ভারতীয় বাজার। যদি কোনো রাজ্য বলতে চায়, 'আমার এখানে বিনিয়োগ না করলে শালা মাল বেচতেও দেবনা' তাকে সেটা বলার সুযোগ দেওয়া হবেনা। সেটা বলার অধিকার তার নেই। বললেই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি লেকচার থেকে শুরু করে, মিলিটারি নামানো অবধি হতে পারে। সব মিলিয়ে এই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক হচপচের একটি সুবৃহৎ লক্ষ্য আছে। বৃহত্তর অ্যাজেন্ডা আছে। যে, হে রাজ্যগণ, বৃহৎ পুঁজিকে সুবিধে পাইয়ে দেবার জন্য তোমরা কামড়াকামড়ি করে মর, কিন্তু মাল বেচার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত দিয়োনা।

এর নাম খোলা হাওয়া। সুস্থ প্রতিযোগিতা। ফ্রি মার্কেট। তাইওয়ান-সিঙ্গাপুরকে লক্ষ্য করে এগোনো। পুরোটাই পার্ট অফ দা গ্র্যান্ড ডিজাইন। পুরোটাই বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে। এবং, এটা শুধু অর্থনীতির সমস্যা নয়। শুধু রাজনীতিরও সমস্যা নয়। অখন্ড ভারতবর্ষ নামক একটি রাজনৈতিক ধারণাকে, ফ্রি মার্কেট নামক একটি অর্থনৈতিক ধারণাকে, এবং আরও অন্যান্য ডিসিপ্লিনে অন্যন্য ধারণাকে বিকল্পবিহীন বলে চালানো হচ্ছে। মনে হচ্ছে এগুলো খুব 'স্বাভাবিক' ধারণা। এর বাইরে বেরোনো যায়না। যা সত্যি নয়।

এর উল্টোদিকে কি থাকতে পারে, ফাঁকফোকর কিকি আছে, সে আলোচনায় আমরা আসব, তবে তার আগে আমাদের আলোচনার আরেকটা অ্যাজেন্ডা আছে, যেটাকে সিভিল সোসাইটির এক নম্বর ঐকমত্য বলে অভিহিত করেছি আগের অনুচ্ছেদে, সেটা সেরে নেওয়া যাক।

৪।

অ্যাজেন্ডা নম্বর এক। আর পিছিয়ে থাকা নয়। এবার ‘উন্নত’ হতে হবে। আমেরিকা না হোক, নিদেনপক্ষে সিঙ্গাপুর তাইওয়ান হতে হবে। এটা এই মূহুর্তে দেশের এক নম্বর অ্যাজেন্ডা। যার ফলে ভারতবর্ষের অনেক জায়গার সঙ্গে সিঙ্গুরও উঠে আসছে শিরোনামে। শুধু বাজারি হুল্লোড়ে নয়, সিরিয়াস আলোচনাতেও শুভ্রবসন রাজনীতিবিদ, বা দাড়িওয়ালা অর্থনীতিবিদদের গম্ভীর আলোচনাতে সেসব প্রসঙ্গ উঠে আসছে। দুটো কথা খুব শোনা যাচ্ছে। বলা ভালো হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এক। কৃষি ছেড়ে শিল্প চাই। কৃষি থেকে শিল্প, এটাই সভ্যতা। এটাই অগ্রগতি। এবং এই পথেই চলতে হবে।

দুই। কৃষি আর লাভজনক নেই। কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্রমশঃ কমছে।

এতক্ষণ হাওয়ায় হাওয়ায় খেলা হচ্ছিল। এবার সিঙ্গুরের নির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে, এই দুটো দাবীকে একটু খুঁটিয়ে দেখব।

এক নম্বর। কৃষির বদলে শিল্প চাই।

সিঙ্গুরে শুধু কৃষি হয় আর এবার শিল্প হবে, আদপেই ব্যাপারটা তা নয়। সিঙ্গুরে শিল্প আছে। শুধু আধুনিক শিল্প বলতে যে ঝা চকচকে হাই ফান্ডা ব্যাপারস্যাপার আমাদের মনে আসে, সেটা অবশ্যই নেই। শিল্প বলতে সিঙ্গুরে এই মূহুর্তে যা আছে, তা হল আলু। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে থেকে তারকেশ্বর রোড এক্সিট নিয়ে যদি মাইলখানেক যান, রতনপুর বলে একটি জায়গায় পৌঁছবেন। আরো স্পেসিফিকালি বললে জায়গাটার নাম রতনপুর ‘আলুর মোড়’। জায়গাটার নাম আলুর মোড়, কারণ ওটা এই মূহুর্তে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো আলু প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গুলোর মধ্যে একটা। সবচেয়ে বড়ো পাইকারি বাজারও বটে।

এখন আলু প্রক্রিয়াকরণ বলতে আপনি যদি চিপস বানানোর কথা ভাবেন, তাহলে সেটা ওখানে হয়না। যেটা হয়, সেটা হল, সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে ইটের গুড়ো মাখিয়ে আলুকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করা এবং মার্কেটেবল(দেখতে সুন্দর) করে তোলা। এই কাজে প্রচুর লোকে যুক্ত। সঠিক সংখ্যা বলা যাবেনা, কিন্তু সংখ্যাটা অন্ততঃ হাজার তিন তো বটেই (অনুসারী সব শিল্প, যেমন চায়ের দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি ধরে বললাম)। আরো বেশিই হবে। এটা সম্পূর্ণ অসংগঠিত শিল্প। ছোটো ছোটো মালিক/আড়তদাররা চালায়।

এবার এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংগঠিত মাঝারি শিল্প। যার নাম হিমঘর। আলুর মোড় থেকে আলু বস্তায় ভরা হয়, যার স্থানীয় নাম 'প্যাকেট'। এই প্যাকেটগুলি সোজা চলে যায় হিমঘরে। এই এলাকায় হিমঘরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। দুই কিলোমিটারের মধ্যে চার-পাঁচটা হিমঘর পাবেন। তারপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো অনেকগুলো। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, হিমঘর কি শিল্প? একশবার শিল্প। কারণ একেকটা হিমঘরের পিছনে প্রাথমিক বিনিয়োগ, এই বাজারে খুব কম করে ধরলে পাঁচ কোটি টাকা। এবং একেকটি হিমঘর অন্ততঃ একশ লোকের কর্মসংস্থান করে। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনুসারী কর্মসংস্থান তো আছেই, যেমন ভ্যান চালক, চা-টিফিনের দোকান, ভাতের হোটেল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতেও যদি একে শিল্প বলতে আপত্তি থাকে, তাহলে আরো একটি তথ্য। আলুর প্যাকেট আপনি যদি হিমঘরে জমা করেন, তার বিনিময়ে হিমঘর আপনাকে একটা রিসিট দেবে, যার স্থানীয় নাম আলুর বন্ড। এই আলুর বন্ডেরও একটা বাজার আছে, যাকে শেয়ার বাজার বা সেকেন্ডারি মার্কেটের সঙ্গে দিব্যি তুলনা করা যায়। আলুর বন্ডের দাম শেয়ার বাজারের মতই নাটকীয় ভাবে ওঠে-নামে। এই বাজারের ব্রোকার আছে। এই মার্কেটে টাকা লগ্নী করেন বহু বহু মানুষ। করে খান অনেকে। কেউ কেউ অবভিয়াসলি প্রচুর লসও করেন। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা রমরমা বাজার। জমাটি শিল্প এবং জমাটি ইকনমি।

ফলে সিঙ্গুরে শিল্প ছিলনা এবং আজ হবে কথাটা ঠিক না। শিল্প ছিল, কিন্তু 'শিল্পায়ন'এর বিজ্ঞাপন হবার মতো শিল্প ছিলনা।

এবার একটার জায়গায় দুটো শিল্প হলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ঘটনা হল, এলাকার আলু চাষের জমির একটা বড়ো অংশ চলে যাচ্ছে কারখানা করতে। ফলে চাষ কমবে। আলুর আড়তে লোকের কর্মসংকোচন হবে। হিমঘরগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য না (অন্ততঃ এক-দুটো হবেই মনে হয়)। এর ফলে ঐ এলাকার অর্থনীতিতে, যা হিসাব করা হচ্ছে, তার চেয়ে একটা অনেক বড়ো ইমপ্যাক্ট পড়বে। কিন্তু সেসব কেউ হিসেব করেছেন কি? সরকার চাষীদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে ব্যস্ত, বিরোধীরাও তাই। সেটা ভালো কথা, এবং অন্য ইস্যু। কিন্তু বিগার ইমপ্যাক্টটা যা ভাবা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো। যে, একটা শিল্পের বিনিময়ে আরেকটা শিল্প হচ্ছে। শুধু কৃষির বিনিময়ে নয়।

এবং এর উপরে বিষফোঁড়ার মতো আসছে আম্বানিদের হাইটেক হিমঘর। সে প্রশ্নে পরে আসছি।

দুই নম্বর। কৃষি আর লাভজনক নেই।

গ্রামবাংলায় যারা একটুও রাজনীতি করেছেন, তারা জানেন, কথাটা অর্ধসত্য। কৃষি আর লাভজনক নেই ছোটো চাষীর কাছে, বা তাদের কাছে, যাদের জীবিকা একমাত্র কৃষি। এখন কৃষিতে নিযুক্ত ক্ষেতমজুরদের আয় বেড়েছে, বড়ো চাষীরও আয় বেড়েছে, আর আর বেড়েছে একশ্রেণীর মধ্যসত্বভোগীদের।

একটু ব্যাখ্যা করি। সিঙ্গুরের উদাহরণই নিন। যখন নতুন আলু ওঠে, তার দাম অস্বাভাবিকরকম কম থাকে। যত দিন যায় আলুর দাম তত বাড়ে। সেই কারণেই লোকে হিমঘরে লোকে আলু জমিয়ে রাখে। এবং বন্ডের দামের প্রবল ওঠাপড়া সত্বেও ঐ প্রাথমিক দামের চেয়ে আলুর দাম অনেকটাই বাড়ে।

ফলে আলু চাষে আপনি তখনই ভালো আয় করবেন, যখন আপনি আলু ওঠার পর কিছুদিন সেটা স্টক করতে পারবেন। সঙ্গে সঙ্গে বেচে দিলে খুব কম লাভ। এবার ছোটো চাষি, খুব সঙ্গত কারণেই স্টক করতে পারেনা। তারা ফড়ে বা মধ্যসত্বভোগীকে বেচে দেয় আলু নামমাত্র মূল্যে। এবার ফড়েরা সেটা নিয়ে ঐ সেকেন্ডারি মার্কেটে ফাটকা খেলে। এবং সাধারণভাবে প্রচুর লাভ করে। একই ভাবে যে পরিবারের অন্য সোর্স অফ ইনকাম আছে, তারাও ভালই লাভ করে, কিন্তু গরীব চাষী করেনা।

ফলে চাষে আর উপার্জন হয়না কথাটা, আগেই বলছিলাম, অর্ধসত্য। প্রকৃত পক্ষে, এই দ্বিতীয় পয়েন্টটা আমি নতুন কিছু বললামনা। এটা কৃষক সভারও অনেক দিনের বক্তব্য। এবং দাবী এই, যে সরকার ন্যায্যদামে আলু কিনে পরে বাজারে বেচুক। সরকারও লাভ করুক, কিন্তু তার একটা অংশ যেন ছোটো কৃষক পায়।

এই দাবী মেনে কিছু কিছু পদক্ষেপও নিয়েছিল সরকার। ফাটকাবাজি বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে ন্যায্যদামে ফসল কেনারও কথা চলছিল, যদিও সরকারের আর্থিক অসঙ্গতির কারণে (সেরকমই বলা হয়েছিল) বেশিদূর এগোনো যায়নি।

এই ছিল অবস্থা। সেটা ভালো ছিলনা বিশেষ। কিন্তু আজকে যেটা হচ্ছে, ন্যায্য দামে ফসল কেনার মহান দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসছে আম্বানি। কি তার পলিসি, কি ডিটেল, যথারীতি জানা নেই।

তো,এবার গোটা উন্নয়নের মডেলটাকে এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে ভেবে দেখুন। ঠান্ডা মাথায়। একটি কারখানা (ধরা যাক টাটার কারখানা) কর্মসংস্থান ঘটাবে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বহুফসলি কৃষিজনিতে সেটা করলে মূল্যটা অনেক বেশি দিতে হবে।

এক। পুরোনো শিল্পকে ভেঙেচুরে আপনি একটা নতুন শিল্প বসাচ্ছেন। কর্মসংস্থান হচ্ছে, কিন্তু এমনি এমনি নয়। সেটা হচ্ছে একটা বিপুল কর্মসংকোচনের মূল্যে।

দুই। এই যে লোকগুলি কাজ হারালো বা হারাবে, আর বিনিময়ে যারা কাজ পাবে, তারা আলাদা স্তরের লোক। যে লোকটি আলুর আড়তে কাজ করে, তার পক্ষে নতুন শিল্পে জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন। নতুন শিল্পে যে কাজ পাবে, সে শিবপুর/যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। বা সমস্তরীয় কেউ। একটা গোটা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় অন্য একটা সামাজিক ব্যবস্থাকে বসাচ্ছেন। এবং এই উন্নয়ন থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে আলুর আড়তের ঠিকে শ্রমিক, যার আলুতে ইটের হুঁড়ো

মাখানো ছাড়া আর কোনো যোগ্যতা নেই।

তিন। এই প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হচ্ছে, যখন আপনি প্রচলিত হিমঘরের জায়গায় নিয়ে আসছেন আম্বানি নামক একটি মনোপলি চেনকে। খবরের কাগজে পড়া, যে, তারা চাষিদের (পড়ুন ফড়েদের) কাছ থেকে ফসল কিনে গুদামজাত করে খুচরো/পাইকিরি বাজারে মাল ছাড়বে। এটা নিয়ে কিঞ্চিত হইচই হয়েছিল, যার ফোকাল পয়েন্টটা ছিল, এতে করে খুচরো বিক্রেতারা মার খাবে কিনা (যে কারণে সরকার ওয়ালমার্টকে ঢুকতে দিতে রাজি ছিলনা)। খুচরো বিক্রেতাদের সমস্যাটা এই আলোচনায় ঢোকানোর দরকার নেই। এখানে বড়ো সমস্যাটা হল, যে গ্রামীণ হিমঘরগুলিকে এতদ্বারা আপনি একটি বিপদের মুখে দঁড় করিয়ে দিলেন।

এরকম নয়, যে, আম্বানি এলেই ধুড়ধাড় করে সব হিমঘরগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও সেরকম একটা আশঙ্কা আছেই। মনোপলি ব্যবসা সবসময়েই শুরুর দিকে দাম কমানোর লড়াইয়ে নামে পোটেনশিয়াল প্রতিযোগীদের বাজার থেকে আউট করে দেবার জন্য। সেটা একটা বড়ো বিপদের দিক। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার হল, আপনি বিগ ইন্ডাস্ট্রিকে অ্যালেজেডলি সস্তায় জমি দিচ্ছেন প্রাইম লোকেশনে, সস্তায় বিদ্যুত দিচ্ছেন, আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন। এগুলো শোনা যাচ্ছে। যদি সত্যি ই তাই হয়, তাহলে ফ্রি কম্পিটিশনের কোনো জায়গাই থাকছেনা। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ফ্রি কম্পিটিশন থাকার দরকার আছে বা নেই, বা সেটা কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু ফ্রি কম্পিটিশন না থাকলে বাকি হিমঘগুলো একে একে বন্ধ হবে। আপনি আমি যারা শহরে থাকি বা থাকব, জানতে পারবনা। কিন্তু একটা গোটা সংগঠিত শিল্প পশ্চিমবঙ্গ থেকে আস্তে আস্তে হাওয়া হয়ে যাবে।

ফলে, এখানে মূল বক্তব্যটা হল, আপনি যখন শিল্পায়নের কথা বলছেন, তখন, আসলে কৃষির বদলে শিল্পের কথা বলছেননা। একটা গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা, যার কিছুটা কৃষি কিছুটা শিল্প, সেটাকে উৎখাত করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা নতুন অর্ডার অফ থিংস আনার চেষ্টা করছেন। আসলে শিল্প মানেই ব্যাঙ্গালোর, শিল্প মানেই একটা ঝা চকচকে ব্যাপার, শিল্প মানেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রচুর চাকরি, এই আইডিয়াটা আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে। আমি আপনি মুখ্যমন্ত্রী আনন্দবাজার সবার মধ্যে।

আসলে আপনি শিল্প বানাচ্ছেন না। শিল্পকে ধ্বংস করছেন। এবং সেই ধ্বংসের মধ্যে বসে বেহালা বাজাচ্ছেন। শুধু আগুনগুলো আগুন নয় আর, এখন তারা নিয়ন আলো।

৫।

আসলে আমাদের মধ্যে একটা স্বপ্ন ঢুকে আছে। একটা আইডিয়া। আমরা যারা বিদেশে থাকি, বা যারা থাকিনা, তাদের বারবারই মনে হয়, দেশটা কেন এতো পিছিয়ে থাকবে ? কেন হাইওয়ে থাকবেনা, কেন ইন্ডাস্ট্রি থাকবেনা, কেন ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকবেনা। খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাবনা। এই যে, আমি লিখলাম, শিল্পায়নের এই মডেল আমি সমর্থন করিনা, এই আমিই কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, যে ছবির মতো রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে একটা এক্সিট নিয়ে টুক করে বাড়ি পৌঁছে যাওয়া গেলে আমার ভালো লাগবেনা ? এই লিখতে লিখতেই দৃশ্যটা কল্পনা করে দেখলাম, সেটা হলে দিব্যি হয় কিন্তু। এবং, মনের মধ্যে সেই ইচ্ছেটা আছে কোথাও।

এবং মনের মধ্যের এই স্বপ্নটার সঙ্গে সিঙ্গুরের রিয়েলিটি মেলেনা কোথাও, এটাই সমস্যা। পশ্চিমে যেভাবে শিল্পবিপ্লব হয়েছিল, সেটার আর রেপ্লিকেশন সম্ভব নয়, করতে গেলে, ঐ মার্কসের কথামতো 'দ্বিতীয়টি হবে উপহাস'। কেন নয়, তার অনেক কারণ আছে। এক। কলোনিয়াল বাজার নেই। দুই। শিল্প মাত্রেই এখন ভয়াবহ ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিল্পবিপ্লব পশ্চিমে অনেক ভয়াবহ কান্ড ঘটিয়েছে। সিঙ্গুরের ক্ষেত্রে আম্বানি টাম্বানি টেনে এনে যা-যা বললাম, যে, একটা প্রোডাকশন সিস্টেমকে উৎখাত করে আরেকটাকে বসানো হচ্ছে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি উৎখাতের ইতিহাস পশ্চিমে আছে। কিন্তু সেটা সামলানো গিয়েছিল তার কারণ ঐ দুটো। একটা মোটরগাড়ি তৈরিতে সে সময় অনেক বেশি লোক লাগতো, শিল্প অনেক বেশি লেবার ইনটেনসিভ ছিল সে সময়। এবং একটা প্রতিদ্বন্দীহীন অখন্ড কলোনিয়াল বাজার ছিল। ফলে উৎখাত সত্বেও সব লোককেই মোটামুটি বিকল্প জব দেওয়া গেছিল।

এই দুটোর কোনোটাই আজ বাস্তব নয়। উত্তর-কলোনি তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়ন যে পরিমান মানুষকে উৎখাত করবে, তার চেয়ে অনেক কম লোককে কাজ দেবে। একটি গোটা উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় চাপিয়ে দেবে একটা ভীষণরকম স্পেশালাইজড এবং ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ উৎপাদন ব্যবস্থা। কমিউনিটির সক্রিয় কর্মীবাহিনীর একটা অংশকে উদ্বৃত্তে পরিণত করবে। শুধু তাইই নয়, এই শিল্পায়নের খেলায় নামতে গিয়ে, আরও বেশি বেশি শিল্পপতিদেরকে ডেকে আনতে গিয়ে, তাদের আরও আরও বেশি সুযোগ দিতে গিয়ে রাজ্যগুলো একরকম ভাবে নি:স্ব হয়ে যেতে বসবে। এবং সেই ঘাটতি ঢাকতে তাদের নামতে হবে রিয়েল এস্টেটের বিজনেসে। সেটাও হবে শিল্পায়নের নামে। এ জিনিস আমরা একবার দেখেছি রাজারহাটে নতুন নগরী পত্তনের সময়। ভবিষ্যতে সালিম এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর হাত ধরে আরও দেখব বলে আশা করা যায়।

আর এই অন্ধকারকে ঢাকার জন্যই, এই অসঙ্গতিকে ঢাকার জন্যই আরো বেশি বেশি করে হতে থাকবে ফ্লাই ওভার, রাস্তা, শপিং মল আর বহুতল বিল্ডিং। হবে উন্নয়ন। সেসবের জন্য আসবে এইড, অর্থাৎ ঋণ, এবং তাতে আরো আরো বেশি করে এই সার্কুলার লুপে আটকে পড়ার সম্ভাবনা, যা থেকে আর বেরোনো যাবেনা। এবং পুরো ব্যাপারটা যে শুধু বস্তুগত ঘুষ দিয়ে হবে তাতো নয়। নিজের দেশকে

আমেরিকা না হোক অন্ততঃ সিঙ্গাপুর করে তোলার যে গভীর স্বপ্ন আমাদের, স্রেফ সেই স্বপ্নের জন্যই আমরা, সফটওয়্যারের কেরানিরা, সংবাদপত্রের স্ট্রিট স্মার্ট যুবকযুবতীরা, ম্যানেজমেন্ট ডিপ্লোমাধারী টাইপিস্টরা, এই প্রোজেক্টকে সমর্থন করে যাব। আমাদের স্বপ্নকে আরো ঝকঝকে করে তুলবে টিভি চ্যানেলের চব্বিশ ঘন্টার উন্নয়নের খবর, সংবাদপত্রের রোজকার উদারনৈতিক ঢক্কানিনাদ, শপিং মলের নিত্যনতুন আইটেম, নতুন নতুন ফ্লাই ওভার। শুধু এটুকুই নয়, এটুকু তো ঘুষ মাত্র, শুধু ঘুষ দিয়ে কি আর মানুষকে বেশিদিন পক্ষে রাখা যায় ? আমাদের মধ্যে যারা একটু রাজনৈতিক সচেতনতার খেলা খেলতে ভালোবাসি, যারা একটু অর্থনীতি নিয়ে নাড়াচাড়া করি, বা যারা সত্যিই একটু চর্চা টর্চা করি, কলেজে টলেজে পড়াই, তাদেরকে তো ঘুষিয়ে পক্ষে রাখা যাবেনা। তাদের জন্য আছে থিয়োরি। অর্থনীতি। খোলা বাজার, রাজ্যে রাজ্যে প্রতিযোগিতার দর্শন। বাংলাকে সিঙ্গাপুর বানিয়ে তোলার যে রূপরেখাটি বাজারে ছাড়া হয়েছে, তার পিছনে আছে বেশ কিছু তথ্য, পরিসংখ্যান, কিছু বিশ্লেষণ এবং ঝকঝকে প্রেজেন্টেশন, যাকে আজকাল অর্থনীতিও বলা হচ্ছে। খোলা বাজারের একটি ফর্মকে অর্থনীতির শেষ কথা বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং এই অর্থনীতিকে বেচছেন দক্ষ, স্মার্ট, বুদ্ধিমান একদল মানুষ, যাদেরকে ইকনমিক কনসালট্যান্ট বলা হয়। এদেরই একজন হলেন অশ্বিনী আদরকার, যাকে নিয়ে এই লেখা শুরু।

তাঁরা যা বেচছেন, তার নাম অর্থনীতি নয়, তার নাম স্বপ্ন। যুক্তির মোড়কে। দর্শনের মোড়কে। অর্থনীতির মোড়কে। এবং সেই স্বপ্নকে বুকে নিয়ে বাঁচছি আমরা, যারা সফটওয়্যারের কারিগর, যারা কলেজের অধ্যাপক, যারা ব্যাঙ্কের কেরানি। আমরা হয়ে উঠছি এই স্বপ্নের স্বনিযুক্ত ফেরিওয়ালা। এই স্বপ্নের নাম সিঙ্গাপুর হয়ে ওঠার স্বপ্ন। যার অনেক কারিগরের একটি হল ম্যাকিনসে। নাটবল্টুর মতো অজস্র মানুষ জড়িয়ে আছেন এইসব স্বপ্ন তৈরির কারখানায়, তাদেরই একজন অশ্বিন আদরকার।

এই স্বপ্নের মেকানিজমটা, স্বপ্ন দেখানোর এবং দেখার মেকানিজমটা আমাদের ভালো করে বোঝা দরকার। শেষ করার আগে আমরা তাই এখানে একটু চোখ বুলিয়ে নেব, স্বপ্নের একজন প্রাক্তন কারিগরের কিছু স্বীকারোক্তিতে। অল্প কিছু কনফেশানে। যাতে, তা থেকে এই গোটা বিষয়টা, ডেস্টিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে শুরু করে সিঙ্গুর পর্যন্ত পুরো বিষয়টাকে আমরা এই মেকানিজমের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি। এই কনফেশন অংশটুকু, অনুবাদ থেকে শুরু করে, ছোটোখাটো মন্তব্য পর্যন্ত পুরোটাই হুবহু আমি তুলছি ত্রিদিব সেনগুপ্তর লেখা থেকে।

এক অর্থনৈতিক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি

অর্থনৈতিক হত্যাকারী বা ইকনমিক হিটম্যান, যার সংক্ষেপনাম বা অ্যাক্রোনিম ‘ইএইচএম’। একটা বই। লেখক জন পার্কিনস, এক প্রাক্তন ইএইচএম। ‘কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হিট ম্যান’ বইটা ২০০৪ সালে প্রকাশিত, পেপারব্যাকে, প্রকাশক ক্যালিফোর্নিয়ার বেরেট-কোলার। এই বইয়ের ভূমিকার বা প্রিফেসের প্রায় গোটাটারই একটা অনুবাদ আমরা এখানে হাজির করছি, যার সঙ্গে মিলিয়ে সিঙ্গুর-হাওড়া-হরিপুর-বারুইপুরের এই উন্নয়নের গ্লোবালাইজেশনের খেলাকে আমাদের বোঝা দরকার। একটা কথা মনে পড়িয়ে দিই, পরে ভূমিকাটা পড়তে পড়তে যেটা আরো স্পষ্ট হবে,

যখনই পার্কিনস শুধু ‘সরকার’ কথাটা উল্লেখ করছেন, বা, ‘আমরা’, বোঝাচ্ছেন আমেরিকা সরকারকে বা রাষ্ট্রকে।

#

> ইকনমিক হিটম্যান বা ইএইচএম মানে বিরাট আয়ের পেশাদার। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবঞ্চনা করে এরা আয় করে অর্বুদ অর্বুদ ডলার। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, আন্তর্জাতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বানানো মার্কিন সংস্থা ইউএসএইড থেকে, এবং অন্যান্য নানা আন্তর্জাতিক ‘সহায়তা’ বা ‘এইড’ সংগঠন থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ এরা সরিয়ে নিয়ে আসে এই গ্রহের প্রাকৃতিক সম্পদ যাদের হাতে, মানে দৈত্যাকার কিছু বাণিজ্যসংস্থা এবং হাতে গোনা কয়েকটি ধনী পরিবারের ভাণ্ডারে। এই কাজে এই ইএইচএমরা ব্যবহার করে নানা অস্ত্র। যেমন ভুয়ো হিশাব এবং তার রিপোর্ট, ইলেকশন রিগিং, ঘুষ, দালালি, ভয় দেখানো, সেক্স এবং খুন। সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের সমান প্রাচীন তাদের এই খেলা একটা নতুন, দগদগে এবং আতঙ্কের মাত্রা পেয়েছে এই চালু গ্লোবালাইজেশনের সময়ে এসে।
>
> এটা আমার জানারই কথা, আমি একজন ইএইচএম।

ওইটুকু লিখেছিলাম ১৯৮২-তে, একটা বই, যার কাজ-চালানো নাম দিয়েছিলাম, ‘এক অর্থনৈতিক খুনীর নীতিবোধ’, ‘কনশেন্স অফ অ্যান ইকনমিক হিটম্যান’, তার শুরুটা। বইটা উৎসর্গ করা ছিল দুই দেশের দুই রাষ্ট্রপ্রধানের নামে, যাদের জন্যে আমি কাজ করেছি, কোমল অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হিশেবে যাদের দুজনকেই আমি শ্রদ্ধা করি – হাইমে রোল্ডোস, ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট, এবং ওমর তোরিহোস, পানামার প্রেসিডেন্ট। এর অল্পদিন আগেই মারা গেছিলেন এরা দুজনেই, প্লেন ভেঙে পড়ে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছিল এদের। এই মৃত্যু কোনো দুর্ঘটনা না। এদের হত্যা করা হয়েছিল, কারণ, ব্যবসায়ীদের, সরকারের আর ব্যাংকপ্রধানদের মিলিত গোষ্ঠীস্বার্থের এরা বিরোধিতা করেছিলেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াব্যাপী সাম্রাজ্য দখল করা। রোল্ডোস আর তোরিহোসকে নতিস্বীকার করাতে ব্যর্থ হয়েছিলাম আমরা ইএইচএম-রা, অর্থনৈতিক হত্যাকারীরা, তাই ডাক পড়েছিল জ্যাকল গোত্রের সিআইএ-স্বীকৃত অন্য হত্যাকারীদের, যারা সদাসর্বদাই অপেক্ষা করে ঠিক আমাদের পিছনের সারিতে।

আমার উপর চাপ দেওয়া হয়েছিল, এই বইটা যাতে আমি না-লিখি। এর পরের কুড়ি বছরে আরো চারবার বইটা লেখায় হাত দিয়েছি আমি। প্রত্যেকবারই আমার সিদ্ধান্তের উপর ছায়া ফেলেছে চালু আন্তর্জাতিক দুনিয়ার নানা ঘটমানতা: ১৯৮৯-এ আমেরিকার পানামা আক্রমণ, প্রথম গাল্ফ ওয়ার, সোমালিয়া, ওসামা বিন লাদেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই হয় ভয় দেখানো, নয় ঘুষ, কোনও না কোনও কারণে পিছিয়ে গেছি।

২০০৩-এ একটি বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, যে প্রতিষ্ঠানের মালিক এক ক্ষমতাশালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা, আমার ওই বইয়ের খসড়াটা পড়েন, যে বইয়ের এখনকার আকার এই ‘এক অর্থনৈতিক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি’, ‘কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হিটম্যান’। তাঁর রর্ণনায়, বইটা “একটা টানটান বিবরণ, যা লোকের কাছে পৌঁছনো দরকার।” এরপর তাঁর মুখে এল একটা বিষণ্ণ স্মিত হাসি, মাথা ঝাঁকালেন নিজের, এবং বললেন, তাঁদের বিশ্বব্যাপী উচ্চতম অফিসে, ওয়ার্ল্ড হেড কোয়ার্টারে, পদস্থ লোকদের যেহেতু এতে আপত্তি হতেই পারে, এই বইটা

ছাপানোর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁর। আমাকে পরামর্শ দিলেন বইটাকে একটা কাহিনীর আকার দেওয়ার। "একজন ঔপন্যাসিকের আকারে আমরা আপনাকে বাজারে আনতেই পারি, ধরুন জন লে কার, বা, গ্রাহাম গ্রিন।"

কিন্তু, এটা তো কাহিনী নয়। আমার নিজের জীবনের বাস্তব ঘটনার বিবরণ। আর একটু সাহসী এক প্রকাশনা, কোনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থা যার মালিক নয়, আমাকে আমার কথা বলতে দিতে রাজি হল।

এই ঘটনাগুলো মানুষের জানাটা জরুরি। আমাদের ঘিরে রয়েছে একটা বিকট সঙ্কটের প্রহর – এবং বিশাল সম্ভাবনারও। এই একজন অর্থনৈতিক খুনীর বিবরণ আমাদের দেখিয়ে দেয়, কী করে সেই জায়গাটায় এসে পৌঁছলাম আমরা যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি, এবং কেন এই সম্মুখীন সঙ্কট এরকম অনতিক্রম্য বোধ হচ্ছে আমাদের। জানাটা জরুরি এই কারণে যে আমাদের বিগত ত্রুটিগুলোকে বুঝে নেওয়ার ভিত্তিতেই কেবল আমরা আমাদের ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলোর সুযোগ নিতে পারি। জানাটা জরুরি কারণ, ৯/১১ ঘটে গেছে এবং ঘটে গেছে ইরাকের দ্বিতীয় যুদ্ধও। জরুরি কারণ, শুধু ১১ই সেপ্টেম্বার, ২০০১-এর, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত ওই তিন হাজার মানুষ নয়, মারা গেছে আরো চব্বিশ হাজার মানুষ, খিদেয় বা খিদের কারণে। বস্তুত, প্রত্যেকটা দিন মারা যায় চব্বিশ হাজার মানুষ, কারণ তারা তাদের বেঁচে থাকার মত খাদ্য যোগাড় করতে পারেনি।[*১*] এই বিবরণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে, তার সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, ইতিহাসে এই প্রথম, একটি রাষ্ট্রের হাতে এই সামর্থ রয়েছে, এই অর্থ, এই ক্ষমতা, যে সে এর গোটাটাই বদলে দিতে পারে। সেই রাষ্ট্র যেখানে আমি জন্মেছি, যার ইএইচএম হয়ে কাজ করেছি: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

শেষ অব্দি কী করে আমি পারলাম ওই ভয় দেখানো আর ঘুষ এগুলোকে আর গ্রাহ্য না-করতে?

এর একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর আমার একমাত্র সন্তান, আমার মেয়ে জেসিকা, কলেজ পাশ করে যে বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে, দাঁড়িয়েছে ওর নিজের পায়ে। কিছুদিন আগে যখন ওকে বললাম যে এই বইটা ছাপাব কিনা ভাবছি, আমার ভয়গুলোর কথা খুলে বললাম ওকে, জেসিকা বলল, "বাবা, চিন্তা কোরো না। ওরা যদি তোমায় কিছু করেও, তুমি যে অব্দি পারলে তার পর আমি ধরব। তোমার যে নাতিনাতনিরা একদিন আমার পেটে হবে বলে ভাবি, তাদের জন্যেই এটা করা দরকার।" এটাই সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

এর দীর্ঘ উত্তরটা হল যে দেশে আমি বড় হয়েছি তার প্রতি আমার দায়বদ্ধতা, যার রাষ্ট্রপিতাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, যে আজ সকলের জন্যে "জীবন, স্বাধীনতা আর সুখ"-এর সংকল্প শোনায়, সকলের জন্যে, প্রত্যেকের জন্যে, ভূগোল নির্বিশেষে, সেই আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতি আমার কর্তব্য, এবং ৯/১১-র পর আর চুপচাপ ঘরে বসে ইএইচএম-দের হাতে গ্রহজোড়া সাম্রাজ্য নির্মাণ না-দেখার আমার দৃঢ় সিদ্ধান্ত। এটা হল সেই দীর্ঘ উত্তরের কঙ্কাল-কাঠামো। এই বইয়ের পরবর্তী অধ্যায়গুলো সেই কঙ্কালের উপর রক্তমাংস চাপিয়েছে।

এই গোটা বিবরণটাই একটা সত্য ঘটনা। এর প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার বেঁচে থাকা দিয়ে তৈরি। আমার বিবরণের দৃশ্যগুলো, মানুষগুলো, কথোপকথনগুলো সবই আমার বেঁচে থাকার অংশ। এই

বিবরণ আমার ব্যক্তিগত, কিন্তু এর প্রেক্ষাপট হল বৃহত্তর পৃথিবীর ঘটমান বাস্তবতা, যা আমাদের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছে, আজ আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে এসে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের ভিত্তিটা তৈরি করে দিয়েছে। যতদূর সম্ভব নিখুঁত করে আমি হাজির করার চেষ্টা করেছি এই অভিজ্ঞতা, সেই মানুষগুলো, তাদের কথোপকথন। যেখানেই আমি এমন কোনও ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছি যা ইতিহাস হয়ে গেছে, বা, অন্যদের সঙ্গে ঘটা কোনও কথোপকথন পুনর্নির্মাণ করছি, সেটা আমি করছি অনেকগুলো জিনিসের সাহায্যে: ছাপা তথ্য; ব্যক্তিগত নথী ও নোটস; স্মৃতি – আমার নিজের এবং যারা সেই ঘটনায় অংশ নিয়েছিল; এই বই লেখার চেষ্টায় আগে লেখা পুরোনো পাঁচটা পাণ্ডুলিপি; ওই ইতিহাস নিয়ে অন্য লেখকদের লেখা, সবচেয়ে বেশি করে সদ্য প্রকাশিত সেইসব লেখা যা এমন কোনও তথ্য সামনে আনে যা এতদিন অপ্রকাশিত বা ঘোষিত ভাবে গোপন ছিল। সেই তথ্যনির্দেশগুলো দেওয়া আছে শেষে দেওয়া নোটস-এ, যাতে আগ্রহী পাঠক এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো গভীরে যেতে পারে। কোথাও কোথাও আমি বাস্তবে ঘটা একাধিক কথোপকথনকে গুটিয়ে এনেছি একজন ব্যক্তির সঙ্গে ঘটা একটা কথোপকথনে যাতে বিবরণটা সাবলীল ভাবে এগোতে পারে।

আমার প্রকাশক আমায় প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা বাস্তবিকই নিজেদের ইকনমিক হিট ম্যান বলে ডাকি কিনা। আমি তাকে নিশ্চিন্ত করেছিলাম, সত্যিই আমরা ডাকি, যদিও সচরাচর ওই সংক্ষেপনামের প্রথম অক্ষরগুলো দিয়ে। ১৯৭১এ যেদিন আমার পরিচয় হল আমার ইএইচএম হয়ে ওঠার শিক্ষক ক্লডিনের সঙ্গে, সত্যি সত্যিই ক্লডিন আমায় বলেছিল, "আমার কাজ এখন তোমায় একজন ইকনমিক হিট ম্যান বানিয়ে তোলা। তোমার এই যোগাযোগ আর কেউ জানবে না, এমনকি তোমার স্ত্রী-ও না।" তারপর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "একবার এখানে ঢোকা মানে, সারা জীবনের মত ঢোকা।"

পুতুলনাচের সুতোর মত নিয়ন্ত্রণের একটা চমৎকার উদাহরণ ক্লডিনের ভূমিকাটা, আমার নতুন যোগ দেওয়া এই কাজের এলাকার তলায় তলায় যা কাজ করে চলে। সুন্দর দেখতে এবং বুদ্ধিমান, ক্লডিন ছিল খুবই কাজের; আমার দুর্বলতাগুলো বুঝত এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গায় সেগুলোকে ব্যবহার করত। তার কাজ, এবং যে ভাবে সেই কাজটা সমাপন করত ক্লডিন, এই কাঠামোর পিছনের মানুষগুলোর সূক্ষ্মতার সেটা একটা উদাহরণ।

আমায় ঠিক কী করতে হবে, সেটা বলতে গিয়ে ক্লডিন কোনও রাখঢাক করত না। আমার কাজ হল, ক্লডিন বলেছিল, "বিশ্বের সব দেশের নেতাদের উৎসাহ দেওয়া যাতে তারা বহুধাবিস্তৃত সেই নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে ওঠে, আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা আর বাড়িয়ে তোলা যে নেটওয়ার্কের কাজ। শেষ অব্দি এই নেতারা জড়িয়ে পড়ে ঋণের জালে, যা তাদের বিশ্বস্ত রাখার রক্ষাকবচ। যাতে, যখনই চাই, আমরা তাদের টেনে আনতে পারি – আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বা মিলিটারি প্রয়োজন মেটাতে। এর বিনিময়ে, এরাও মানুষের কাছে এদের রাজনৈতিক অবস্থাকে জোরালো করে তোলে, শিল্প-পার্ক, বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র, বা এয়ারপোর্ট বানিয়ে দিয়ে। মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারিং/নির্মাণ কোম্পানিগুলোও বিপুল আয় করতে পারে।"

আজকে আমাদের চারদিকে আমরা দেখছি এই ব্যবস্থা হিংস্রভাবে কাজ করে চলার ফলাফল। আমাদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কোম্পানিগুলো কাজের লোক ভাড়া করছে প্রায় দাসব্যবস্থার মত মজুরিতে, এশিয়ার ঘামে ভেজা কারখানায় কারখানায় অমানুষিক সব পরিস্থিতিতে তারা কাজ করে চলেছে। তেল কোম্পানিগুলো কোনও নিয়মনীতির বালাই না-রেখে মৌসুমী অরণ্য অঞ্চলের, রেইন ফরেস্টের নদীতে নদীতে ঢেলে চলেছে তীব্র টক্সিন বিষ, তাতে যে মানুষ, পশু এবং গাছ মারা যাচ্ছে একথা জেনেই, গণহত্যা ঘটিয়ে চলেছে প্রাচীন সব জনগোষ্ঠীগুলোয়। আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ এইচআইভি-সংক্রমিত মানুষকে জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে ওষুধের কোম্পানিগুলো। শুধু আমাদের আমেরিকাতেই এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবার তাদের পরবর্তী খাবার কী হবে সেটা জানে না।[*২*] শক্তি উৎপাদনের ব্যবসা থেকে আমরা পাই এনরন। হিশাবরক্ষার অ্যাকাউন্টিং ব্যবসা থেকে পাই অ্যান্ডারসেন। পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ, যারা বাস করে উচ্চতম আয়ের দেশগুলোয়, আর এক-পঞ্চমাংশ যারা বাস করে দরিদ্রতম আয়ের দেশগুলোয়, এদের আয়ের অনুপাত ১৯৬০-এ ছিল ৩০-এ ১, সেটা নেমে গিয়ে ১৯৯৫-এ দাঁড়ায় ৭৪-এ ১।[*৩*] আমেরিকা শুধু ইরাক যুদ্ধের জন্যে ব্যয় করে ৮,৭০০ কোটি ডলার, রাষ্ট্রসংঘের হিশেবে, যার অর্ধেকেরও কম খরচে এই গ্রহের প্রত্যেকটি মানুষকে জোগানো যেত পরিস্কার জল, পর্যাপ্ত খাদ্য, নিকাশী ব্যবস্থা, এবং প্রাথমিক শিক্ষা।[*৪*]

এবং, সন্ত্রাসবাদীরা আমাদের আক্রমণ করলে আমরা অবাক হই?

কেউ কেউ আমাদের চালু সমস্যাগুলোর দায় চাপান একটা সুসংগঠিত যড়যন্ত্রের উপর। গোটাটা এত সরল হলে আমার নিজেরই ভালো লাগত। ষড়যন্ত্র হলে, তার পাণ্ডাদের ধরে আনা যায়, তাদের বিচার করা যায়। এই ব্যবস্থা কিন্তু চলে ষড়যন্ত্রের চেয়ে অনেক বিপজ্জনক কিছু দিয়ে। একে চালায় হাতে গোনা কিছু লোকের কোনও দল নয়, চালায় একটা ধারণা। একটা ধারণা যা প্রায় দৈববাণীর আকার নিয়েছে। ধারণাটা এই যে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, ইকনমিক গ্রোথ, মানেই তা মানবসমাজের মঙ্গল করে, এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যত বেশি হয় ততই বাড়ে এই মঙ্গল। এই বিশ্বাসের একটা সহগ উপবিশ্বাসও আছে: অর্থনৈতিক বৃদ্ধির চুল্লীতে ঘি ঢালতে যারা সবচেয়ে ভালো পারে, তাদের সম্মানিত করো, পুরস্কার দাও, যখন বঞ্চনা আর শোষণ করার জন্যে তারা তো আছেই যারা পরিধিতে গজিয়েছে।

নিশ্চিত ভাবেই ধারণাটা ভুল। আমরা জানি, অনেক দেশেই, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থেকে লাভ পায় জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এবং বাস্তবিকই, এই বৃদ্ধির কারণে বৃহত্তর অংশের মানুষের পরিস্থিতি আরো শোচনীয় হয়ে উঠতেই পারে। এই ফলাফলকে আরো জোরালো করে তোলে ওই উপবিশ্বাসটা, যে, শিল্প ইত্যাদির কাপ্তেনরা, যারা এই ব্যবস্থাটাকে চালাচ্ছে, তাদের একটা বিশেষ সমাদর পাওয়ার কথা, এই বিশ্বাসটাই আমাদের অনেকগুলো চালু সমস্যার মূল কারণ, এবং, বোধহয় এই কারনেই, অত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব চালু আছে চারদিকে। যখন মানুষ ও মানুষীরা তাদের লোভের জন্যে পুরস্কার পায়, লোভই হয়ে দাঁড়ায় দুর্নীতি ছড়িয়ে দেওয়ার চালিকাশক্তি। যখন আমরা পৃথিবীর সম্পদগুলোকে খেয়ে ফেলার রাক্ষুসে খিদেকে তুলনা করি প্রায় সন্তদের সঙ্গে, আমাদের বাচ্চাদের শেখাই, ওই ওদের অনুসরণ করো যারা প্রথম থেকেই বাঁচছে একটা ভারসাম্যহীন জীবন,

এবং যখন আমরা মোট মানুষের একটা বিশাল অংশকে একটা সংখ্যালঘু কুলীন অংশের আজ্ঞাবাহী বলে ধরে নিই, আমরা ডেকে আনি সঙ্কটকে। এবং সে আসে।

দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবিস্তারের আগ্রহে বাণিজ্যসংস্থাগুলো, ব্যাংকগুলো এবং সরকারগুলো মিলে (সম্মিলিত ভাবে কর্পোরেটোক্র্যাসি বা বানিয়াতন্ত্র) ব্যবহার করে তাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পেশী, যাতে আমাদের বিদ্যালয়গুলো, ব্যবসাগুলো এবং প্রচারমাধ্যমগুলো অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত ওই ভুল বিশ্বাস এবং উপবিশ্বাসগুলোকে সমর্থন করে। এরা আমাদের এমন একটা জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যেখানে আমাদের বিশ্বায়নের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা দানবিক যন্ত্র যাকে চালানোর জন্যে দরকার পড়ছে প্রতি মুহূর্তে আরো আরো বেশি করে জ্বালানি এবং নজরদারি, এতটাই যে, শেষ অব্দি এই যন্ত্র এর চোখের সামনে প্রত্যেককে খেয়ে ফেলার পর যন্ত্রের আর কোনও উপায় থাকবে না নিজেই নিজেকে খেয়ে ফেলা ছাড়া।

এই বানিয়াতন্ত্র কোনও ষড়যন্ত্র নয়, কিন্তু এর সভ্যদের সকলেরই আছে একটা একই সাধারণ মূল্যবোধ এবং উদ্দেশ্য। কর্পোরেটোক্র্যাসির, বানিয়াতন্ত্রের, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটা হল এই ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আরও বড় এবং আরও শক্তিশালী করে তোলা। সেই লোকগুলোর জীবন, যারা এটাকে বানিয়ে তোলে, এবং তাদের ধড়াচুড়ো – প্রাসাদ, জলযান, ব্যাক্তিগত প্লেন – এগুলো তুলে ধরা হয় আদর্শ হিশেবে, যাতে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হতে পারি, ভোগ করো, ভোগ করো, ভোগ করো। আমাদের বোঝানোর এমন একটা সুযোগও ছাড়া হয়না, যে, ক্রয় করাই আমাদের নাগরিক দায়িত্ব, বসুন্ধরাকে লুণ্ঠন করাই অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গল, তাই আমাদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য জরুরি। আমার মত মানুষদের বীভৎস মাইনে দিয়ে পোষা হয় যাতে আমরা ব্যবস্থার হয়ে নিলাম করতে পারি। যদি আমরা হোঁচট খাই, আমাদের জায়গা নেয় আরও ভয়ঙ্কর হত্যাকারী, জ্যাকলের মত লোকেরা।

এই বইটা এমন একটা মানুষের স্বীকারোক্তি, যে, সেই ইএইচএম থাকার সময় থেকেই, একটা ছোট দলের একজন। ওই একই ভূমিকার একই রকম লোকদের সংখ্যা আরও বাড়ছে। তাদের ডাকা হয় অনেক ভদ্র নামে; মনসানতো, জেনেরাল ইলেকট্রিক, নাইক, জেনেরাল মোটরস, ওয়াল-মার্ট, এবং আরও, বিশ্বেরযাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্যসংস্থার অন্দরমহলে এদের হাঁটাহাঁটি। ভীষণ বাস্তব একটা অর্থে, ‘একটি অর্থনৈতিক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি’, ‘কনফেশনস অফ অ্যান ইকনমিক হিট ম্যান’, শুধু আমার না, তাদের সকলেরই বিবরণ।

এটা আপনারও বিবরণ, আপনার এবং আমার পৃথিবীর বিবরণ, সত্য অর্থে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের বিবরণ। ইতিহাস আমাদের বলে, যদি-না এই বিবরণটাকে বদলাই আমরা, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল বিয়োগান্ত। কোনও সাম্রাজ্যই টিকে থাকে না। প্রতিটি সাম্রাজ্যই মর্মান্তিক ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। শাসন ও ক্ষমতার ঘোড়দৌড়ে তারা বহু জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে, এবং তারপর, নিজেরাও ধ্বংস হয়। অন্যকে নিষ্পেষিত করে কোনও জাতি বা জাতি-সমাহারই বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনা।

এই বইটা লেখা হয়েছিল, যাতে আমরা কান দিতে পারি এবং বিবরণটাকে বদলে নিতে পারি। আমি

নিশ্চিত যে, যদি আমাদের মধ্যে থেকে যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ সচেতন হই, কী ভাবে আমাদের নিষ্পেষণ করা হচ্ছে এই অর্থনৈতিক যন্ত্রে, যা এই বসুধার সমস্ত সম্পদের প্রতি বানিয়ে তুলছে একটা তৃপ্তিহীন ক্ষুধা, এবং তৈরি করছে একটা বদলি দাসব্যবস্থা, আমরা আর একে সহ্য করব না। আমরা প্রত্যেকেই এই পৃথিবীতে নিজের ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন করব, যেখানে সামান্য কয়েকজন সম্পদের স্রোতে সাঁতার কাটে, আর বেশিরভাগ মানুষ ডুবে থাকে দারিদ্রে, দূষণে, এবং রক্তপাতে। আমরা চেষ্টা করব পথ খুঁজে পাওয়ার, মমতা, গনতন্ত্র আর সকলের জন্যে সামাজিক ন্যায়ের দিকে।

সমস্যাটাকে স্বীকার করা হল সমাধান খোঁজার প্রথম পদক্ষেপ। পাপের স্বীকারোক্তিই পাপমোচনের শুরু। এই বইটা দিয়ে তাই আমাদের উদ্ধারের আরম্ভ হোক। দায়বদ্ধতার নতুন স্তরের দিকে আমাদের উৎসাহিত করুক এই বইটা, ভারসাম্যের এবং সম্মানজনক সমাজের স্বপ্ন-পূরণের দিকে আমাদের নিয়ে চলুক।

নোটস:

১ রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, (http://www.wfp.org/index.asp?section=1, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৩ সালের ওয়েবপেজ)। এছাড়া, ন্যাপসেক, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অফ স্টারভেশন, বিচার করে পেয়েছে, "প্রতি দিন ৩৪,০০০ বাচ্চা, যাদের বয়স পাঁচের নিচে, মারা যায় খিদে থেকে, বা খিদে থেকে তৈরি প্রতিরোধযোগ্য অসুখে" (http://www.napsoc.org, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৩)। স্টারভেশন-ডট-নেটের (http://www.starvation.net, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৩) ধারণা, "যদি আমরা (অনাহারের পরে) পরবর্তী দুটো উপায়কে যোগ করি, দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমরা যাতে মারা যায়, জলবাহিত অসুখ এবং এইডস, আমরা দিনপ্রতি হিশেবে মোটামুটি শবের সংখ্যা পাব ৫০,০০০।"

২ মার্কিন সরকারের কৃষি বিভাগ, এফআরএসি বা ফুড রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন সেন্টারের রিপোর্ট (http://www.frac.org, ২৭শে ডিসেম্বর, ২০০৩)।

৩ রাষ্ট্র সংঘ। 'হিউম্যান ডিভেলপমেন্ট রিপোর্ট'(নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড নেশনস, ১৯৯৯)।

৪ "১৯৯৮-এ, ইউনাইটেড নেশনস ডিভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, ধারণা করেছিল, যে আরো ৯০০ কোটি ডলার লাগবে (চালু খরচের উপরে বাড়তি) যাতে পরিস্কার জল এবং নিকাশী ব্যবস্থা দেওয়া যায় এই পৃথিবীর প্রত্যেককে। পৃথিবীব্যাপী সমস্ত মেয়েদের প্রজনন সংক্রান্ত চিকিৎসার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্যে লাগবে আরো ১২০০ কোটি ডলার। পৃথিবীর প্রত্যেকে যাতে পর্যাপ্ত খাদ্য পায় এবং মোটামুটি চিকিৎসাও, তার জন্যে লাগবে আরো ১৩০০ কোটি ডলার। আরো ৬০০ কোটি ডলার লাগবে সবার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। ... সব মিলিয়ে দাঁড়ায় ৪০০০ কোটি ডলার।"– জন রবিনস, 'ডায়েট ফর এ নিউ আমেরিকা' এবং 'ফুড রেভলিউশন' বইয়ের লেখক (http://www.foodrevolution.org, ২৭শে ডিসেম্বার, ২০০৩)।

(Confessions of an Economic Hitman. By John Perkins. Berrett-Koehler Publishers, Inc. 235 Montgomery Street, Suite 650, San Francisco, www.bkconnection .com)

অনুবাদ: ত্রিদিব সেনগুপ্ত

পার্কিনসের লেখা থেকে এই মেকানিজমের একটা দিক পরিস্কার। একদিকে যেমন বিশ্বায়নের এজেন্টরা, কয়েকটি কেন্দ্রীভূত গ্লোবাল সংগঠনের হয়ে কাজ করেন, এটা যেমন সত্যি, তেমনি অন্যদিকে, এটাও সত্যি, যে পুরোটাই একটা বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীয় সুসংগঠিত ষড়যন্ত্র নয়। ব্যাপারটা অতো সরল আদৌ নয়। শিল্পায়নের স্বপক্ষে যিনি কথা বলছেন, তিনি কোনো বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের টাকা খাচ্ছেন, বা দালাল, বা একজন ঘৃণ্য জীব, তা নাই হতে পারে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নয়। আসলে কোনো নির্দিষ্ট ষড়যন্ত্রকারী নয়, পার্কিনস যেভাবে বলেছেন, যে পুরোটাই একটা আইডিয়া থেকে চলে। মানুষকে স্রেফ ঘুষ দিয়ে কাজ করানো যায়না বেশিদিন। করালেও, সে, সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েনা। মানুষ যন্ত্র নয়। সে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে, যে, সে ভালো কাজ করছে। অতএব, সে এই ধারণাটায় বিশ্বাস করে, যে, ইকনমিক গ্রোথ মানেই সেটা মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। অতএব গ্রোথ চাই উন্নয়ন চাই। তার সামনে যে কোনো প্রতিবন্ধক, তাকে, বৃহত্তর হিতের কারণেই গুঁড়িয়ে দাও। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের ভাষায়, কৃষি থেকে শিল্প, এটাই সভ্যতা, নাহলে শেষ হয়ে যেতে হবে। অতএব, এর সামনের সকল বাধাকে গুঁড়িয়ে দাও বৃহত্তর কল্যাণের কারণে।

এবং অর্থনীতিবিদরা এই ধারণাটাকে সেল করেন। বিক্রি করেন। মারধোর না, যুক্তিতর্কও না, এটাকে মার্কেট করা হয়। করেন অর্থনীতিবিদরা। ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টরা। এবং রিঅ্যাকটিভলি নয়, করেন প্রো-অ্যাকটিভলি। কার হয়ে মার্কেট করেন বলা খুব শক্ত। খুব সম্ভবত: বৃহত্তর মানবস্বার্থের হয়েই। অন্যদিকে এই আইডিয়ার যারা কনসিউমার, তাঁরাও বৃহত্তর মানবস্বার্থেরই কথা ভাবেন। ফলে কোনো এক জায়গায় ঐকমত্য হয়। জেনারেটেড হয় ট্রুথ। তৈরি হয় বিজ্ঞান। ধনতন্ত্র এবং মার্কসবাদী বীক্ষণ কোনো এক জায়গায় এসে এক বিন্দুতে মেশে।

তো, এই মেকানিজমটা আমাদের বুঝতে হবে। আগের প্যারাগ্রাফেই লিখলাম, এই মার্কেটিং রি-অ্যাকটিভ নয়, প্রো-অ্যাকটিভ। এই দুটো ধারণা, আজকের ম্যানেজমেন্ট জগতে খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা আজকের ইন থিং। এবং এই মেকানিজমে প্রো-অ্যাকটিভ নামক বর্গটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেটা এইখানে আমরা ছোটো করে বুঝে নেব।

প্রো-অ্যাকটিভ, যাকে এরপর থেকে এই লেখায় কখনও কখনও আমি প্রসক্রিয় বলব (কথাটার কোনো মানে না দাঁড়ালেও শুনতে বেশ), কি ? অথবা কে ? ম্যানেজমেন্টের নিচু তলার লোকজন শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। এবং অন্য আরো সমস্ত বর্গের মতই, এটাকেও বোঝা হয় রি-অ্যাকটিভ নামক একটির বর্গের বিপরীতে। রি-অ্যাকটিভ কে ? যার কোনো ইনিশিয়েটিভ নেই, যে ডায়নামিক নয়, কোনো সমস্যার সামনে পড়লে কেবলমাত্র তারপরই সে সেটাকে নিয়ে ভাবে, এবং কোনো রকমে সেই জিনিসটার প্রতি রিঅ্যাক্ট করেই সে নিজের কর্মসমাধা করে, সেই রি-অ্যাক্টিভ। উল্টো দিকে প্রো-অ্যাকটিভ হল সে, যে

ডায়নামিক, পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই ইনিশিয়েটিভ নেয়, এবং সমস্যার সমাধান সে করেনা, বরং সে একটা পরিস্থিতি তৈরি হবার আগেই ইন্টারভেন করে বলে, সমস্যাটা তৈরি হতেই দেয়না।

এগুলো চালু পপুলার সংজ্ঞা। বোঝবার সুবিধের জন্য দেওয়া। কিন্তু আসলে প্রো-অ্যাকটিভ মানুষকে নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনা নেই এখানে, আমাদের আলোচনা প্রো-অ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচ নামক ক্যাটিগরি টা নিয়ে। বা কনসেপ্ট টা নিয়ে। এখানে কিছু ম্যানেজমেন্টের বই থেকে রেফারেন্স দিতে পারলে ভালো হত, কিন্তু দু:খের বিষয় সেসব আমার কাছে নেই, অতএব, একটু হাওয়ায় হাওয়ায়ই খেলতে হবে। কোনো মারকাটারি অ্যাকাডেমিক লেখা তো হচ্ছেনা, কাজেই, তাতে বিশেষ সমস্যা আছে বলে মনে হয়না।

তো, এই প্রো-অ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচকে বোঝার জন্য আরও দুটো বর্গ ব্যবহার করা জরুরি। এক। সার্কল অফ ইন্টারফেয়ারেন্স। সেটা কি? সেটা একটা লোকের (লোক দিয়েই বলছি শর্টে মারার জন্য)চেনাশোনার বৃত্ত। দুই। সার্কল অফ কন্টোল। সেটা কি ? একটা লোকের চেনাশোনার বৃত্তের সবার সঙ্গে তো লোকটির সম্পর্ক একরকম নয়। কারোর সঙ্গে শুধু মিষ্টি হাসি, কারোর সঙ্গে হাই-হ্যালো, কারোর সঙ্গে ঝগড়া, কাউকে ইয়েস স্যার, কেউ বন্ধু, কেউ আজ্ঞাবহ। এদের মধ্যে একটা অংশের চিন্তা-ভাবনা-কর্মপদ্ধতিকে লোকটি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আদেশ দিয়েই হোক, বা বুঝিয়ে সুঝিয়েই হোক, বা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করেই হোক। যে অংশটিকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সেটি হল তার নিয়ন্ত্রণের বৃত্ত।

এবার প্রসক্রিয়তা কি ? না, নিয়ন্ত্রণের বৃত্তকে ক্রমশ বাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। লক্ষ্যটা হল, এটাকে বাড়িয়ে চেনাশোনার বৃত্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। ব্যস। এটা যদি করতে পারি আমি, তাহলে প্রো-অ্যাকটিভ শিরোমনি। আমার পরিচিত সবাইকেই যদি আমি একরকম করে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে কোনো সমস্যা কখনও তৈরিই হবেনা। সমস্যাটা তৈরি হবার আগেই আমি তা বুঝে ফেলব, এবং তাতে ইন্টারভেন করব। সমস্যাটাকে টেবিলের উপর আসতেই দেবনা, আগেই খাল্লাস।

এবং শুধু এইটুকুই না। পুরোটাই যদি আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে এইটুকুতে থেমে যাবার কোনো মানে নেই। নিয়ন্ত্রণ কথাটাকে যদি খুব যান্ত্রিক ভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তার মানে দাঁড়ায়, যে সবাই আমার আজ্ঞাবহ। সেটা সত্যিই হয়তো নয়। সবাই আমার কথা শোনেনা। এমনকি সবাইকে আমি ইমোশনালি ব্ল্যাকমেলও করতে পারিনা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের আরও একটা অর্থও হয়। নিয়ন্ত্রণ অর্থে জ্ঞান। আমি লোকটিকে জানি। সে লোকটি আমার বিরোধী হতে পারে, আমার আজ্ঞাবহ নাও হতে পারে, কিন্তু আমি তাকে জানি। জানি, যে, কোন লোকটা, বা কোন সামাজিক শক্তি কোন কথায় কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে। আমি আমার সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করতে পারি নিজের মতো করে পুরো সিস্টেমটাকে ওরিয়েন্টেশন দেবার কাজে। আমার সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে, তার অ্যাজেন্ডা একটুও পাল্টাতে না বলেই, আমি নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারি।

একটা ছোট্টো উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিস্কার হবে। ধরা যাক মন্ডল কমিশন। মন্ডল কমিশনের রিপোর্টটিকে যখন ভিপি সিং কার্যকর করলেন, তখন তিনি জানতেন, এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া হবে। মিডিয়া হইচই করবে। উচ্চবর্ণের ছাত্ররা হৈচৈ করবে আন্দোলন করবে।

ঠিক তাইই হয়েছিল। আন্দোলনকারীরা জুতো পালিশ করে প্রমাণ করেছিলেন তাঁরা উচ্চবর্ণ। ওদিকে সরকার সংরক্ষণ চালু করে প্রমাণ করেছিল তারা নিম্নবর্ণ। যত বেশি আত্মাহুতি, যত বেশি স্লোগান, যত বেশি হুঙ্কার দিয়ে বেড়ে উঠছিল আন্দোলন, তত বেশি শক্ত হচ্ছিল মন্ডল রাজনীতির ভিত। সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন যত তীব্রতর হচ্ছিল, ততই স্পষ্ট হচ্ছিল পোলারাইজেশন। ভিপি সিং যে নিম্নবর্ণের মসিহা, এই বাণীটা স্রেফ মন্ডল কমিশনের সুপারিশকে কার্যকর করে ভিপি সিং নিম্নবর্ণের কাছে যতটা পোঁছতে পেরেছিলেন, তার ঢের বেশি কার্যকরভাবে পৌঁছে দিয়েছিল সংরক্ষণবিরোধী আন্দোলন। আন্দোলনের সামনে সরকার যত বেশি করে অনমনীয় হচ্ছিল, নিম্নবর্ণ তত বেশি করে চিনে নিচ্ছিল নিজের আপনজনকে।

তো, এখানে মন্ডল রাজনীতির পক্ষে বিপক্ষে কোনো কথা হচ্ছেনা। কথা হচ্ছে ট্যাকটিক্স নিয়ে। আমার বিরোধী পক্ষীয় লোকটিকে তার অ্যাজেন্ডা একটুও পাল্টাতে না বলেই, আমি নিজের কাজে কিভাবে ব্যবহার করতে পারি, সেই নিয়ে কথা হচ্ছে। ভিপি সিং পেরেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তিনি মূলতঃ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সরকার বিরোধী স্লোগান পোক্ত করেছিল সরকারের পায়ের নিচের জমি। এবং এর সঙ্গে ভিপি সিং জন্ম দিতে পেরেছিলেন এক নতুন সত্যের, যার নাম 'সামাজিক ন্যায়'। এটি গোবলয়ের একটি জেনারেটেড ট্রুথ, একটি অব্যক্ত কনসেনসাস, ভবিষ্যতে যাকে নিয়ে আলোড়িত হবে রাজনীতি।

এর নাম প্রসক্রিয়তা। আলোচনার টেবিলে পোঁছে যুক্তি-তর্ক দিয়ে মীমাংসার চেষ্টা কোরোনা। তার আগেই জেনারেট করো ট্রুথ। তৈরি করো কনসেনসাস। তারপর বসো আলোচনায়। আর একান্তই যারা বিরোধী, তাদের আন্দোলনকেও ব্যবহার করো। অবিকল এই জিনিস আমরা দেখছি শিল্পায়নের অ্যাজেন্ডায়। ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টরা বোঝালেন, তারপর তাঁদের যুক্তির সারবত্তা বুঝে সবাই একমত হলেন, তা নয়। আলোচনার টেবিলে আসার আগেই তৈরি হয়ে গেছে ট্রুথ। কনসেনসাস। দা থিং ইজ সেটলড অফলাইন। একটি আইডিয়ার প্রতি, যাকে পার্কিনস 'দৈববাণী' বলছেন, নতজানু হয়ে গেছেন সবাই। আইডিয়াটা হল, সিঙ্গুরকে সিঙ্গাপুর বানাতে হবেই। কৃষি থেকে শিল্প, এইই একমাত্র রাস্তা।

এর নাম প্রো-অ্যাকটিভ অ্যাপ্রোচ। ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্র যাকে থিয়োরাইজ করেছে। এবং এটি ফালতু জিনিস না। এর মধ্যে ফিলোজফিক্যাল এলিমেন্ট প্রচুর আছে। পুরো গপ্পোটা সংক্ষেপে কি ? একটা অ্যানলজি দিয়ে বলা যাক। দাবা খেলার অ্যানালজি। খেলা চলাকালীন, দাবার সাদা এবং কালো ঘুঁটিগুলোর অবস্থান এবং মুভমেন্ট একে অপরের দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে। সাদা ঘুটিগুলোর অবস্থান নির্ধারণ করে কালোর চালকে, আবার কালোর চাল নির্ধারণ করে সাদার চালকে। সব মিলিয়ে দাবার বোর্ড একটি অতিনির্ধারিত ভূমি। এবার, এই অতিনির্ধারিত ভূমিতেও কিন্তু একজন জেতে আর একজন হারে। যে জেতে, সে খেলার নিয়মকানুনগুলো ভালো করে রপ্ত করেছে। যদি সাদা জেতে,

তাহলে সে কালোর চালগুলোকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পেরেছে। যদিও কালো চাল দিয়েছে তার বিরুদ্ধেই, কিন্তু এই অতিনির্ধারিত ভূমিতে কালোর চালকে সাদা ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থে। সাদা এখানে প্রো-অ্যাকটিভ। কালো আর সাদা একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু তফাৎটা হল, সাদা খেলার নিয়মটা জেনে করছে, আর কালো না জেনে বা কম জেনে করছে -- সে রিঅ্যাকটিভ।

এর মধ্যে ফিলোজফিক্যাল এলিমেন্টটা এই, যে, ওভারডিটারমিনেশান নামক একটি উত্তরাধুনিক ক্যাটিগরির মধ্যে এখানে দুম করে এনে ফেলা হচ্ছে সাবজেক্ট পোজিশানকে। খেলা আর শুধু খেলা নয়, প্রো-অ্যাকটিভতার মানেই হল, এর মধ্যে চলে আসছে খেলোয়াড়ের অস্তিত্ব। তো, এই থিয়োরাইজেশনটা দুম করে করে ফেলা যায়না, তার জন্য বিস্তর ফেনানো দরকার, এখানে সে চেষ্টা না করাই ভালো। কিন্তু এইটুকু আনতেই হল পুরো খেলার মেকানিক্সটা বোঝার জন্য। যে, যদিও একটা কেন্দ্রহীন যন্ত্রের সেবাদাস হিসাবে, টুকরো-টুকরো যন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করে চলেছেন অর্থনীতিবিদরা, ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্টরা, টিভি চ্যানেলের কেরানিরা, সফটওয়্যারের টাইপিস্টরা, যদিও আইডিয়াটা অনেকটা দৈববাণীর মতই, যার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়না, তবুও পুরোটাই হাওয়ায় হাওয়ায় নয়। এর একটা উৎস আছে। একটা আইডিওলজি আছে। এই আইডিওলজি বা আইডিয়া যাই বলুন, সে এই অনিশ্চিত পৃথিবীকে মেনে নিচ্ছে। মেনে নিচ্ছে, যে, তার নিয়ন্ত্রণের বৃত্ত ছোটো। এবং সে সেটাকে বাড়ানোর পদ্ধতিটা থিয়োরাইজ করছে। এই থিয়োরি শেখাচ্ছে, কিকরে বিপরীত মেরুর চিন্তাচেতনাকেও নিজের কাজে ব্যবহার করা যায়। কিকরে জেনারেট করতে হয় ট্রুথ, যাতে আলোচনার টেবিলে পৌঁছনোর আগেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলা যায়। কিকরে প্রথমেই তৈরি করতে হয় তৈরি করতে হয় ঐকমত্য, এবং তার পরে করতে হয় আলোচনা। শিল্পায়নের এই যে মডেল, এটা একটা জেনারেটেড ট্রুথ, একটা প্ল্যানড কনসেনসাস, এর সামনে প্রশ্ন তোলা যাবেনা। কারণ সত্য এক ও অবিভাজ্য। সে বিজ্ঞানও বটে। এবং বৈজ্ঞানিক সত্য একটিই হতে পারে। সত্যের জগতে প্লুরালিটি সম্ভব নয়। এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থনীতিকে। সমাজবিজ্ঞানকে।

আর এই গেমের উল্টোদিকে কালো ঘুটি নিয়ে খেলছেন যে বিরোধীরা, তাঁরা রি-অ্যাক্টিভ খেলা খেলছেন। নিজের আইডিওলজিকে তাঁরা বিজ্ঞান বলে জানেন, অতএব, কনসালট্যান্টের উপস্থাপিত বিজ্ঞানের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা অসহায় হয়ে যাচ্ছেন। ঠিক সেই চালগুলোই দিচ্ছেন, যা সাদা ঘুটি তাঁদের দিয়ে দেওয়াচ্ছে। তাঁরা মেনে নিচ্ছেন, জেনারেটেড ট্রুথকে, কারণ তা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানও যে আসলে জেনারেট করা যায়, বা করতে হয়, নিজের আইডিওলজির পক্ষে, সেটা একটা সচেতন প্রক্রিয়া, সেই চেতনা তাঁদের নেই। অতএব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এ এক পুতুল নাচের ইতিকথা।আমাদের চোখের সামনে ট্রুথ, সত্য, বিজ্ঞান তৈরির খেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থনীতিকে। এবং তাকে বিজ্ঞান বলে প্রচার করা হচ্ছে। তাকে বিকল্পহীন ভাবে, এক ও একমাত্র সত্য হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে জনসমাজে। এবং বলাবাহুল্য, এই দাবীটি ভিত্তিহীন।

৭।

তো, এই সত্য ও বিজ্ঞান বলে যা চালানো হচ্ছে, তা যে বিকল্পহীন, বা ফাঁকফোকরহীন নয়, সেটা এইখানে ছোটো করে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব।এই লেখার শুরুর দিকে ফ্রি মার্কেট এবং ফ্রি কম্পিটিশান নিয়ে আমরা কয়েকটা কথা বলেছিলাম। সেটা নিয়ে পরে খুঁটিয়ে দেখবও বলেছিলাম। সেটাই দেখা যাক এখানে।

এই খোলা বাজারের হাওয়ায়, শোনা যাচ্ছে, রাজ্যে রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। খোলা বাজারের ক্ষেত্রে ওটাই সত্য। বিনয় কোঙারের লেখায় পড়ছি, এই পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সরকার জানাচ্ছে, যে ট্রেড সিক্রেটের কারণে টাটাদের সঙ্গে যে চুক্তি সেটা প্রকাশ করা যাবেনা। শোনা যাচ্ছে, বেশি শর্তটর্ত দেওয়া যাবেনা, তাহলে টাটারা অন্য রাজ্যে চলে যাবে। সব মিলিয়ে খোলা বাজার এবং খোলা প্রতিযোগিতা নামক দুটি ধারণার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। এবং মেনে নেওয়া যে, এই প্রতিযোগিতার বাজারে রাজ্যগুলি নামতে বাধ্য। মেনে নেওয়া, যে, এই প্রতিযোগিতার খেলা একটি লুজ-লুজ গেম। রাজ্যগুলিকে নতজানু হতেই হবে, এবং শিল্পপতিরা যা চাইবেন, সেই সুযোগ সুবিধা দিতেই হবে। নইলে অন্য রাজ্য নিয়ে চলে যাবে শিল্পকে।

জিনিসটা আর বিশদ করছিনা। কারণ সেটা আগেই অন্য একটা অনুচ্ছেদে করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলি, যে, কনসেপ্টটা এরকম, যে, বিনিয়োগের বাজার একটি খোলা বাজার। যার একদিকে পুঁজির ডালি নিয়ে রয়েছে পুঁজিপতি (বিক্রেতা) রা। অন্যদিকে রয়েছে রাজ্যগুলি, যারা ক্রেতা। এবার বাজারের নিয়ম অনুযায়ী পুঁজির জন্য যে দাম স্থির হবে, তা পুঁজির যোগান এবং ক্রেতাদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু চাহিদা প্রচন্ড, এবং যোগান কম, তাই পুঁজির জন্য রাজ্যগুলিকে বিনিয়োগকারীদের প্রচুর মূল্য ধরে দিতে হবে। হবেই।

এই জিনিসটাই বিভিন্ন ফর্মে খাওয়ানো হচ্ছে আপনাকে আমাকে। এখনও হয়নি, কিন্তু আশা করা যাচ্ছে, ইহাই বিজ্ঞান বলাও শুরু হবে কিছুদিন পর। অত:পর, এই কনসেপ্টটিকে আমরা আক্রমন করব। পপুলার লজিক পপুলার কিছু ক্যাটিগরি দিয়ে কিছু পপুলার অ্যাকাডেমিক যুক্তিও সাজিয়ে রাখে, যার বাইরে যাওয়া মুশকিল। এগুলি বৈধতা পায় চালু ইন্সটিটিউশানগুলি থেকে, পন্ডিতদের কাছ থেকে, অতঃপর এদেরকে কাউন্টার করা বেশ কঠিন। তো, সেই কঠিন কাজটা ছোট্টো করে এখানে আমরা করার চেষ্টা করব। খুব বড়ো কিছু লেখা যাবেনা। জাস্ট একটা স্কেচ। এবং বলাবাহুল্য, সেটা অর্থনীতির চালু ক্যাটিগরিগুলি দিয়েই করতে হবে।

তো, এবার আমরা আমাদের জেরার কাজ শুরু করি। স্পষ্টতঃই যোগান-চাহিদার যে আখ্যানটি আগের প্যারাগ্রাফেই বলা হল, তা হল একটি আদর্শ বাজারের গল্প। মার্কেট আন্ডার পারফেক্ট কম্পিটিশন। আদর্শ প্রতিযোগিতার বাজার, যে বাজারে প্রচুর পুঁজিপতি(বিক্রেতা) এবং প্রচুর রাজ্য (ক্রেতা)। অবশ্য ঠিক এটা নাও হতে পারে, কম্পিটিশানটা ইমপারফেক্টও হতে পারে, যদি পুঁজিপতি (বিক্রেতা) সংখ্যায় বেশ কম হয়। অন্ততঃ একটা সামান্য সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে থাকে পুঁজির যোগানের সিংহভাগ।

অন্যদিকে খদ্দের অর্থাৎ রাজ্য বেশি। প্রথম ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আদর্শ বাজার হলে বাজারের নিয়ম অনুযায়ী ঠিক হবে পুঁজির মূল্য কি বা বিনিয়োগের দাম কি। যদি চড়া দাম হয়, তো দিতে হবে, নইলে রাজ্য পিছিয়ে পড়বে। আর যদি দ্বিতীয় ক্ষেত্র হয়, যে বাজারটি ওলিগোপলি চরিত্রের, অর্থাৎ বিক্রেতারাই দাম ঠিক করে, তাহলে, শিল্পপতিদের দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো পথ নেই।

দুটি ক্ষেত্রেই, পশ্চিমবঙ্গ, এবং অন্য যেকোনো রাজ্য দাবার একটি ঘুটি মাত্র। দোকানে গিয়ে কিনবনা বলে আপনি যেমন অষুধের দাম কমাতে পারবেননা, বাজরের সামনে আপনি যেমন অসহায়, সরকারও তাই। তাদের আর কিছু করার নেই।

তো, এই গপ্পোটা এখনকার শিল্পায়নের অ্যাজেন্ডার সঙ্গে খাপে খাপ মিলে যায়। অতঃপর ফিল গুড। আর যখন কিছু করার নেই, চুপ করে বোসো, যতটা পারা যায় সুগার কোটিং দিয়ে কড়া দাওয়াই গেলাও।

কিন্তু মজা হচ্ছে, এই গপ্পোটা ভারতীয় বিনিয়োগের বাজারের রিয়েলিটির সঙ্গে মেলেনা। আদর্শ বাজারের প্রাথমিক শর্ত হল, যেখানে বিক্রেতা প্রায় অসংখ্য এবং ক্রেতাও তাই। আর ওলিগোপলি আন্ডার ইমপারফেক্ট কন্ডিশান্স এর শর্ত হল, ক্রেতা প্রায় অসংখ্য, কিন্তু বিক্রেতা কম। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতার কোনো নিয়ন্ত্রন নেই দামের উপর। পুরোটাই হয় বাজার, নয়, বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু ভারতীয় বিনিয়োগের বাজারে ক্রেতা অসংখ্য নয়। ক্রেতা আসলে সীমিত। ক্রেতা হল ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যগুলি, যাদের সব কটার নামও অনেকে পর পর বলে দিতে পারবেন। পুঁজিপতি বরং সংখ্যায় অনেক বেশি। অর্থাৎ এটি এমন একটি বাজার যার ক্রেতা কম এবং বিক্রেতা বেশি। ফলে ফ্রি মার্কেট বা ওলিগোপলি, কোনো দুটো মডেলই এখানে খাটেনা। যে মডেলটা কাছাকাছি আসে, তার নাম ওলিগোপসনি। সেটা কি? না, বাজারে ক্রেতা কম, বিক্রেতা বেশি, এবং ক্রেতারাই ডিকটেট করে প্রাইস্‌কে। এর একটা উদাহরণ আমেরিকার স্বাস্থ্য বাজার। আমেরিকায় ডাক্তারখানা অনেক, এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানি কম। ফলে কোন চিকিৎসার কি মূল্য সে ব্যাপারে ডাক্তার(বিক্রেতা) নয়, ইনসিওর্যান্স কোম্পানি(ক্রেতা) বা তাদের জোটই শেষ কথা বলে।

তো, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, যদি বিনিয়োগের খোলা বাজারের ধারণা মেনেই নিতে হয়, তাহলেও, এই মডেলটাই হতে পারত রিয়েলিটির কাছাকাছি একটা মডেল। একটা সীমিতসংখ্যক ক্রেতা। তাদের একটা জোট হওয়াই স্বাভাবিক। এবং হলে, একটা সুবেধেজনক অবস্থানে থাকতো ক্রেতারা। তারা প্রাইস ডিক্টেট করত। অন্ততঃ কিছু মাত্রায়।

এখানে একটা ব্যাপার খুব ইন্টারেস্টিং। এই একই সমস্যাটা আমরা গেম থিয়োরির আদলে ভেবে দেখেছি, যে রাজ্যগুলোকে হারতে হবেই। অতএব হাল ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর গতি নেই। আবার সেই একই সমস্যাকে খোলা বাজারের অন্য একটা মডেলে ঢেলে দেখলাম, যে, রাজ্যগুলো দরাদরি করতেই পারে। এ থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। যে অ্যাবসলিউট বিজ্ঞান বা অর্থনীতি বলে কিছু হয়না। আদলে অর্থনীতি বা বিজ্ঞানকে কাজে লাগানো হয় পছন্দমতো ট্রুথ জেনারেট করার জন্য। কোনটা আসল এবং কোনটা নকল ট্রুথ, সে প্রশ্নই এখানে আসেনা, যে যেটা পেতে চায় সে সেটাই পায়। সর্বশক্তিমান

পুঁজি চায় তার নিজের মতো সত্য। সে চায় এমন এক ফ্রি মার্কেট, যেখানে ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাই হল 'সত্য'। সেই সত্য সে খুঁজে পায় অর্থনীতির মধ্যে। বা বলা ভালো সেই সত্য সে খুঁজে বার করে, এবং ধর্মপ্রচারকের বেশে প্রচার করে বেড়ায়। অন্যদিকে, তথাকথিত ভাবে পুঁজির বিরোধী যারা, তারা বিরোধিতা করে ঠিকই, কিন্তু তার আগে পুঁজি নামক আইডিওলজির দ্বারা নির্মিত সত্যকে সে নতজানু হয়ে মেনে নেয়। অত:পর, খেলার ফলাফল সম্পূর্ণভাবেই নির্ধারিত হয়ে যায় পুঁজির পক্ষে। পুঁজি-বিরোধীরাও বিজ্ঞানের স্বার্থে, প্রগতির স্বার্থে, এক ও অবিভাজ্য সত্যের স্বার্থে, আসলে পুঁজির পক্ষেই কথা বলতে থাকেন। একটু-আধটু বিরোধিতা করেন, এবং সবশেষে মেনেও নেন, যা, পুঁজির দ্বারা নির্মিত সত্যকেই আরও শক্তিশালী করে। পুঁজির প্রো-অ্যাকটিভ গেমে এই বিরোধিতাটা হিসাবে ধরাই আছে। সেটাকে সে নিজের কাজেই লাগায়। বিরোধীরা বলেন, সত্যটি শিরোধার্য, গ্র্যান্ড ডিজাইনটি যথাযথ, শুধু এটাকে আরও মানবিক করা প্রয়োজন। কৃষকদের অন্য রাজ্যে কম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, আমরা বেশি দিচ্ছি। জমি নেবার আগে সম্মতি নিচ্ছি, যদিও আইন অনুযায়ী তা নেবার কথা নয়। এই ডামাডোলে যে গল্পটা ভুলে যাওয়া হয়, বা ভুলিয়ে দেওয়া হয়, যে, যে আইনে জমি নেওয়া হচ্ছে, সেটি ১৮৯৪ সালের একটি চূড়ান্ত কলোনিয়াল আইন। সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার নামক যে পবিত্র কনসেপ্টটি চালু করেছিল, সেই অধিকারটুকুও এই আইনে নেই। তৃতীয় বিশ্বের জমি দখলে পুঁজি সম্পত্তির অধিকার নামক কনসেপ্টটিকে স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজন মনে করেনা। অতএব সত্য সেইভাবেই নির্মিত হয়। যে, জমি চাইলে তো দিতে হবেই। কারণ অগ্রগতির স্বার্থেই শিল্পায়ন। শিল্পায়নের স্বার্থেই খোলা বাজার। খোলা বাজারের নিয়ম মেনেই রাজ্যে রাজ্যে কামড়াকামড়ি। ইহাই সত্য।

মজা হচ্ছে, 'সত্য' এর উল্টোদিকেও থাকতে পারত। যে, জমির অধিকার আসলে ব্যক্তির অধিকার। খোলা বাজারের প্রাথমিক শর্ত। খোলা বাজারের একটি ফর্ম হল সংগঠিত ক্রেতাদের কার্টেল। যারা বিক্রেতাদের সঙ্গে জোরালো দরকষাকষি করতে পারে। এগুলো খুব র‍্যাডিক্যাল কিছু নয়, অর্থনীতির প্রাথমিক জায়গা থেকেই ডিডাক্ট করা যায়, আমরা দেখলাম। কিন্তু পুঁজি এই সত্যকে জেনারেটেড হতে দেবেনা। কারণ, তাতে সস্তায় জমি পেতে অসুবিধে হবে। কারণ, ক্রেতাদের সংগঠনের ধারণা অর্থনীতির মধ্যে থেকে আসেনা। এটা আসে অর্থনীতির বাইরে কোনো একটা স্পেসে, যেখানে ক্রেতারা এই সত্যটা জানে, যে, জোট বাঁধলে দরাদরিতে সুবিধে হয়। এই 'সত্য' টা জেনে সচেতন হবার পরে, তবেই সে বাজারের দখল নিতে এগোয়। অতএব, এই সত্যটিকে সত্য হিসাবে উঠে আসতে দেওয়া হবেনা, এটাই পুঁজির অ্যাজেন্ডা। এই অ্যাজেন্ডার হয়ে সে নির্মান করে একটি সত্যকে। এবং টেবিলে পৌঁছনোর আগেই শেষ করে দেয় আলোচনা। পুঁজির সত্যকেই মার্কসবাদও নিজের সত্য বলে গ্রহণ করে।

পুঁজি আর মার্কসবাদ আসলে সহোদর। মার্কসবাদ পুঁজিরই অপর। উভয়ের কাছেই সত্য এক ও অবিভাজ্য। তফাৎটা শুধু এখানে, যে, এই একবিংশ শতাব্দীর উত্তরাধুনিক দুনিয়ায় পুঁজি জেনে গেছে কিভাবে সত্যকে জেনারেট করা যায়। কিভাবে প্রো-অ্যাকটিভ হতে হয়। মার্কসবাদের কাছে, আজও, হায়, সত্য সেই অদ্বৈত, সেই ঈশ্বর, যিনি এক ও অখন্ড। তাই পুঁজির সত্যই মার্কসবাদের সত্য। পুঁজির বিজ্ঞানই মার্কসবাদের বিজ্ঞান। পুঁজির খেলাকে তাই মার্কসবাদী প্র্যাকটিস শত্রুরূপে ভজনা করে মাত্র। তার বেশি কিছু না।

৮।

এই লেখা শুরু করেছিলাম অশ্বিন আদরকারকে দিয়ে। এসে পৌঁছলাম সত্যে। বুঝলাম, যে, সত্য বিজ্ঞান থেকে জেনারেটেড হয়না। বরং বিজ্ঞানই তৈরি হয় সত্যের আধারে। আর সত্যকে তৈরি করে আইডিওলজি। আগের অনুচ্ছেদে পুঁজি বলেছি যতবার, ততবার আসলে এই আইডিওলজিকেই বলেছি। যাকে পার্কিনস বলেছেন দৈববাণী।

আপনি, যদি, আজকের এই দুনিয়ায় দাঁড়িয়ে সর্বশক্তিমান পুঁজির বিরোধিতা করেন, বা করতে চান, তাহলে এই গপ্পোটি আপনাকে বুঝতে হবে। যে, আগে সত্য, পরে আইডিওলজি নয়। বরং উল্টোটাই। কোন সত্যকে আপনি খুঁজে বার করতে চান না নির্ভর করবে আপনার আইডিওলজির উপর। একই ভাবে আগে বিজ্ঞান পরে দর্শন নয়। বরং আপনার দর্শনই ডিকটেট করবে আপনার বিজ্ঞানকে। আপনি কি খুঁজে পেতে চান আগে স্থির করুন, তবেই তাকে পাবেন। আর যাকে না চাহিতেই পেয়েছেন, তাকে টেকন ফর গ্রান্টেড নিয়ে নিলে, খুব সম্ভব, সেটি পুঁজি নামক আইডিওলজি দ্বারা নির্ধারিত একটি সত্য।

এবার এই ওল্টানো দুনিয়ায়, বিস্ময়ে ভ্রমি বিস্ময়ে বলে শুরু হবে আপনার যাত্রা। আর দুনিয়াটাকে এই পাল্টানো পরিপ্রেক্ষিতে যদি না দেখেন, তাহলে, অশ্বিন আদরকারকে দোষ দেবেননা। অশ্বিন আদরকার কোনো ষড়যন্ত্রকারী নন। তিনি শুধু পুঁজির দ্বারা নির্মিত সত্যকে টেকেন ফর গ্রান্টেড গ্রহণ করেছেন আর তা প্রচার করেছেন। এই একই কাজ করে চলেছি আমি আপনি, যারা চায়ের দোকানে গুলতানি দিই, যারা সওদাগরি আপিসে কেরানি, যারা টিভি চ্যানেলে স্টোরি বানাই, সব্বাই। দেশটাকে সিঙ্গাপুর বানাতে হবেই, এই সত্যকে আমরাও টেকেন ফর গ্রান্টেড নিয়েছি। একই কাজ করেছেন, করছেন, আমাদের শুভ্রবসন মুখ্যমন্ত্রী। নির্ধারিত সত্যের এই দুনিয়ায়, তিনি, আপনি, আমি বা অশ্বিন আদরকার, স্রেফ দাবার বোড়ে ছাড়া আর কিছু তো নই।

- **সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়**

৫ই জানুয়ারি, ২০০৭